লণ্ডনে

স্বামী বিবেকানন্দ

(২য় খণ্ড)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
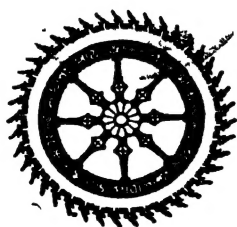
প্রকাশক

শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়, সেক্রেটারি

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি

৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

সিস্টার নিবেদিতা (ইংরাজ মহিলা, Miss Margaret. E. Noble) ও সিস্টার ক্রীস্টিনা (আমেরিকান মহিলা, Miss Chıistina Greenstydel), যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের কার্যের জন্য অতি কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন—
তাঁহাদের উভয়ের পবিত্র স্মৃতি-কল্পে
এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত
হইল।

———

কৃতজ্ঞতা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সেন, ৺বলাই চাঁদ মিত্র ও অপর সকল এবং মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটির কর্ম্মিগণ, যাঁহারা এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ-কালে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

১০ই পৌষ, ১৩৪৫ সাল।

প্রকাশক

প্রকাশকের নিবেদন

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, আমরা ১৩৩৮ সালে প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং এই দীর্ঘ সাত বৎসর পরে আমরা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিলাম। আশা করা যায় যে, আমাদের পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া সাধনমার্গের বিশেষতঃ রাজযোগ সম্বন্ধে অতি জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান লাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই গ্রন্থে আসন, প্রাণায়াম ও সাধনমার্গের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে স্বামিজী লণ্ডনে যে ভাবে লেকচার করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। যদ্যপি কোনও ব্যক্তি এই পুস্তক পাঠ করিয়া রাজযোগ সাধন সম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা হইলে লেখক তাঁহার শ্রম সার্থক মনে করিবেন।

প্রথম সংস্করণ
১০ই পৌষ, ১৩৪৫।

শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

শুভানুধ্যায়ী ও আগ্রহান্বিত পাঠকগণের অনুরোধে আমরা পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের অদ্যাপি অপ্রকাশিত বইগুলির সম্পাদন, মুদ্রণ তথা প্রচারকার্যে অধিকতর মনঃসংযোগ করিতেছি। এইজন্য যাহা একবার প্রকাশিত হইয়াছে সেইসকল গ্রন্থাদির পুনর্মুদ্রণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিতেছে। তবে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের প্রকাশিত অনুধ্যান গ্রন্থমালা ও স্বামিজীর বিষয়ে রচিত যাবতীয় বই যাহাতে সাধারণে প্রচারিত থাকে সে বিষয়ে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিব।

গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণটি প্রথম প্রকাশনের পুনর্মুদ্রণ বলা যাইতে পারে কারণ এই সংস্করণে গ্রন্থের মূল পাঠে কোথাও হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। কাগজ অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় বর্তমান সংস্করণের মূল্য বর্ধিত হইল।

ইতি

৬ই জন্মাষ্টমী, ১৩৬৫। শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
(৮৪ বৎসর বয়সে)

স্বামী বিবেকানন্দ

(লণ্ডনে)

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ

সূর্য্য হইতে পৃথিবী—একদিন লণ্ডনে উপরকার ঘরের লেক্‌চার কালে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবী সূর্য্যের একটা অংশ বিশেষ। সূর্য্য হইতেই এই ধরিত্রী উদ্ভূত হইয়াছে। কোনও সময়ে সূর্য্যের ভিতর বিশেষভাবে কম্পন হয়—সেই কম্পনে দাহ্যমান বাষ্পসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার একটা অংশে আমরা বাস করিতেছি। এই পৃথিবী এবং এইরূপ বহু খগোল সূর্য্যের সর্ব্বপার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই খগোল সকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আকার বিশিষ্ট। বৃহৎ আকারগুলিকে আমরা গ্রহ বলিয়া থাকি এবং ক্ষুদ্র আকারগুলি উল্কা নামে অভিহিত হয়। এইরূপে সূর্য্যের দাহ্যমান বাষ্পরাশি ধীরে ধীরে নিজশক্তি বিকীরণ করিয়া ক্রমে শীতল হইয়া পরিশেষে মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে। কিন্তু সেই একই সূর্য্য পৃথিবীর রূপান্তর মাত্র, এবং পৃথিবীও সূর্য্যের রূপান্তর মাত্র। পৃথিবীতে আমরা যে সকল শক্তি ও উত্তাপপ্রদ বস্তু দেখিতেছি—সমস্তই সূর্য্য হইতে আসিয়াছে। আমরা যে সকল বস্তু আহার করিয়া শরীরের শক্তি বা সামর্থ্য লাভ করি—তাহা পক্ষান্তরে সূর্য্যেরই শক্তি। আমাদিগের চলাচল, গতিবিধি, বাক্যালাপ ইত্যাদি যাহা কিছু করিয়া থাকি, প্রথমতঃ দেখিতেছি যে আহার্য্য বস্তু হইতে সেই শক্তি উদ্ভূত হইতেছে, কিন্তু সেই আহার্য্য বস্তু সূর্য্যের শক্তির রূপান্তর। এইজন্য সূর্য্যের শক্তি অন্য প্রকারে ব্যয়িত করিয়া আমরা নিজশক্তি সঞ্চালন করিতেছি। এই সৌরমণ্ডলের সমস্ত শক্তি সূর্য্য হইতে আসিতেছে। এই

সৌরমণ্ডলের সকল শক্তিরই কেন্দ্র হইতেছে—সূর্য্য। আমরা ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করি, জল সিঞ্চন করি, কিন্তু তাহাতে বীজ হইতে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে না। সূর্য্যশক্তি সংযুক্ত হইলে বীজ হইতে শস্য উৎপন্ন হয়। এইজন্য সূর্যকে শক্তির কেন্দ্র বা আধার বলা হয়।”

এই সময়ে স্বামিজী অতি গভীরভাবের কথা বলিতে লাগিলেন। সৌর জগৎটা কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সকল শক্তি কিরূপে সূর্য্য হইতে আসিয়াছে, এই কথা তিনি বহুপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক জীবের কিরূপে সূর্য্যশক্তির সহিত সম্পর্ক এবং পরস্পরের সহিতও কিরূপ সম্পর্ক তাহাও তিনি অতি গভীরভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

এইপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলিতে লাগিলেন যে “পৃথিবীতে আমরা মনুষ্য ও নানাপ্রকার জীব দেখিতে পাইতেছি এবং বহুবিধ জীবে এই পৃথিবী পরিপূর্ণ ; এই ধরিত্রী ব্যতীত সৌরমণ্ডলে বহু খগোল-মণ্ডল আছে। সবগুলিই এই সূর্য্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই খগোলমণ্ডলে যে জীব নাই তাহা কোনরূপেই অস্বীকার করা যায় না। কোনও না কোন প্রকার জীব এইসকল গ্রহে থাকা সম্ভব। পৃথিবীস্থ প্রাণীর সহিত অপর গোলোকের জীবাদির সহিত সৌসাদৃশ্য না থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সকল স্থানে যে জীব বা প্রাণী নাই একথা কোন প্রকারেই অস্বীকার করা চলে না। নিশ্চয়ই তথায় কোন প্রকার প্রাণী আছে, যাহা আমরা অদ্যাপিও বিশেষ-ভাবে অবগত নই। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে বলে যে, মনুষ্য ইহধামে দেহত্যাগ করিয়া অন্যান্য খগোলে যাইয়া বাস করিয়া থাকে। ইহা হিন্দুদিগের অতি পুরাতন মত। তাহারা অতি প্রাচীনকালে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ধৃতিমণ্ডলে স্থুলদেহ ত্যাগ করিলে—দেহী সূক্ষ্মদেহে অন্যান্য গ্রহে বাস করিয়া থাকে। হিন্দুদিগের গ্রন্থে এইরূপ বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।”

স্বামিজী এই * দিনে অনন্ত স্থানের একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা বা জ্ঞান সকলকে দিয়াছিলেন। যখন তিনি নীহারিকা তথ্যের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন—তখন বোধ হইল, কি অসীম স্থান পড়িয়া রহিয়াছে যাহা আমরা কখনও উপলব্ধি করিতে পারি না। এই দিনে স্বামিজী পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন। দার্শনিক বা ভক্তিভাব তখন তাঁহার আদৌ ছিল না। একজন মহাবৈজ্ঞানিক বা astronomer হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের বিষয়ে তাঁহার কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান ছিল—সেইরাত্রে তিনি তাহাব কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। অসীম ও অনন্ত স্থানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তিনি করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃগণ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

* ["Nebulous Theory"—নীহারিকা তথ্য—মানিয়া লইলে দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টিকার্য্য এখনও চলিতেছে। নীহারিকা বা Nebulous হইতে উপাদান লইয়া পুরাতন গ্রহ সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। যাহাকে আমরা Milkyway বা 'ছায়াপথ' বলিয়া থাকি—উহা পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত এবং উহাতে এত বহু সংখ্যক সূর্য্য বা গ্রহমণ্ডলী রহিয়াছে যে, সকলের রশ্মি অদ্যাপিও এই পৃথিবীতে আসিতে পারে নাই এবং নূতন প্রকাব গ্রহ ও সৌরজগৎ এখনও সৃষ্ট হইতেছে ও পরিশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া উপাদান সকল বিশ্লিষ্ট হইলে পুনরায় সেই নীহারিকা অবস্থায় চলিয়া যাইতেছে। ইহার দূরত্ব ও পরিধি কোনরূপে গণনা করা যায় না,—স্থান অসীম, সৃষ্টিও অসীম।

এইস্থানে একটি কথা বলা আবশ্যক। সূর্য্য হইতে প্রাণী কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তদ্বিষয়ে একটি প্রাচীন কথা আছে— 'আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ—বৃষ্টেরন্নঃ ততঃ প্রজাঃ।' অর্থাৎ আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয় এবং অন্ন হইতে প্রাণী উদ্ভূত হয়।

আরও একটি কথা আছে—'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' ইত্যাদি। স্বামিজী এই দুইটি শ্লোক লক্ষ্য করিয়া সেই রাত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেক্‌চার দিয়াছিলেন। অপর একটি কথা আছে, রাম যখন বনবাসে চলিয়া যান, তখন কৌশল্যা দশরথকে উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন—

"সত্যাৎ সোমঃ সমভবং সোমাৎ ব্রহ্ম ততোঽমৃতং
ঊর্দ্ধে অগ্নিঃ অগ্নেঃ পৃথিবী ভূমির্ভূতানি জজ্ঞিরে।"

ইহার অর্থ—সত্য হইতে সাম্যাবস্থা হইতেছে, সোম হইতে সৃষ্টিমুখীভাব—তাহা হইতে অমৃত, অমৃত হইতে অগ্নি, পরে অগ্নি হইতে পৃথিবী, এবং ভূমি হইতে প্রাণীসকল জন্মাইতেছে।"

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না জানিয়া—এইস্থানে কয়েকটি কথা সন্নিবেশিত করা হইল। একটি কথা আছে—'পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শীলা বর্ষীব পর্ব্বতঃ।' ইন্দ্র পক্ষচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে, পর্ব্বত শীলা বর্ষণ করিতে লাগিল। এইজন্য ইন্দ্রের একটি নাম হইতেছে গোত্রভিদ্ অর্থাৎ পর্ব্বতের পক্ষছেদনকারী। ইহা পৌরাণিক গল্প। পুরাকালে গিরিরাজির পক্ষ ছিল, তাহারা যদৃচ্ছা উড়িয়া বেড়াইতে পারিত এবং নানাস্থানে সহসা পতিত হওয়ায় সেই সকল স্থল বিনষ্ট হইয়া যাইত। এইজন্য ইন্দ্র গিরিসমূহের পক্ষচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা ইহা বলা যাইতে পারে যে বাষ্পীয় অবস্থা বা gaseous state হইতে শীতল হইয়া যখন ঘনীভূত অবস্থায় আসিতে লাগিল তখন এই খগোল তরল অবস্থায় ছিল—ইংরাজীতে ইহাকে state of marl বলা হয়। এই তরল অবস্থায় এই খগোল [illegible] বেগে ভ্রাম্যমান হওয়ায়—বিশাল তরঙ্গায়িত হইয়া নানাভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোন স্থলে অত্যুচ্চতরঙ্গ, কোন স্থলে অতি গভীর উপত্যকাদির সৃষ্টি হইল। কিন্তু আবরনী-বৈদ্যুতিক শক্তি বা encasing electricity প্রতিঘাত হইয়া নিরন্তর বজ্রপাত ও বৈদ্যুতিক রশ্মি সঞ্চারিত ও

সন্নিবেশিত করিতে লাগিল। ক্রমেই তরল পদার্থ দৃঢ় ঘনীভূত হইয়া কাঠিন্যভাব ধারণ করিল। এইরূপে দ্রব-তরঙ্গরাশি সহসা কাঠিন্যপ্রাপ্ত ও দৃঢ়ীভূত হওয়ায় পর্ব্বতরাশিরূপে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বতের উৎপত্তি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে ভারতীয় চিন্তাশীলগণ এই বিষয়টি রূপকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ভাষা প্রাচীন হওয়ায় পৌরাণিকভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, যথা, ইন্দ্র 'বজ্র মারিল' ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উভয়ভাবে একই হয় এবং সূর্য্য হইতেই যে ধরিত্রী বা পৃথিবী আসিয়াছে—ইহা তাহার এক সমর্থক যুক্তি।] *

চন্দ্র হইতে উদ্ভিদাদির সৃষ্টি—স্বামিজী বলিতে লাগিলেন হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে, চন্দ্র হইতে উদ্ভিদ সকল এই ধরিত্রীতে আসিয়াছে। এই বিষয়টি তিনি বহু শ্লোক উদ্ধৃত কবিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিষয়টি ভাল বুঝিতে না পারায়, সমস্ত কথা স্মরণ নাই।

চন্দ্রের একটি নাম আছে—ঔষধিনাথ। স্বামিজীর লেক্‌চারের বিষয় চিন্তা করিবার, উপলব্ধি কহিবার, শুধু শব্দ বা ভাষা দিয়া ব্যাখ্যা করিবার নহে।

কর্ত্তব্য ও ভালবাসা—Duty & Love—একদিন লেক্‌চার প্রসঙ্গে স্বামিজী একটি নূতন ভাব বলিতে লাগিলেন। "ইংরাজি ভাষাতে একটি শব্দ আছে 'Duty'—অর্থাৎ যে কাজ আমাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইবে। পাশ্চাত্যগণ এইভাবে প্রণোদিত হইয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি—অপর ব্যক্তিকে ত্রাস বা অর্থলোভে বশীভূত করিয়া হীনশক্তি-ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে। এই সকল কার্য্যে সেই ব্যক্তির ইচ্ছা আছে কি না এই বিষয়ে কোনও বিবেচনা করা হয় না। প্রভু যেমন ক্রীতদাসকে আজ্ঞাধীন করিয়া কার্য্য

* টীকা—গ্রন্থকার।

করাইয়া লয়, তাহাতে সেই ক্রীতদাসের মনোভাব ব্যক্ত করিবার কোনও অধিকার নাই; সেইরূপ 'Duty' এই শব্দটি কার্য্যকরী-ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু ভারতীয়দিগের চিন্তাশক্তি অন্যপ্রকার। তাহারা ভালবাসা দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকে। ভালবাসাই কার্য্যের মূল বা motive power। 'Duty' শব্দটির অনুরূপ ভাবব্যঞ্জক শব্দ—সংস্কৃত ভাষায় নাই। কারণ হিন্দুজাতি এইভাবে কখনও চিন্তা করেন নাই। ভালবাসার অর্থ—আত্মপরিসর বা 'Self-expansion অথবা self-emanation—আত্মবিকাশ। কোন বস্তু বা কার্য্যের ভিতর আত্মন্ বা অহংকে স্ফুট বা অস্ফুটভাবে পরিলক্ষিত করা। সেইজন্য সেই কার্য্য বা বস্তু লাভের জন্য জীব প্রয়াস করে। নিজের প্রতিবিম্ব বা অনুরূপকে লাভ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে—কার্য্যে প্রণোদিত করিবার ইচ্ছা বা যাহাকে ইংরাজীতে বলে incentive to action। ভালবাসার জন্যই সকল কার্য্য করা হইয়া থাকে। বিপদাপন্ন শিশু সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য মাতা যে অকুতোভয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যায়, ইহা কেবল ভালবাসার জন্য। 'Duty' বা কর্ত্তব্য অর্থে আদান-প্রদানের ভাব থাকে। এক ব্যক্তি এতটা উপকার বা benefit দিলে, অপর ব্যক্তি এত পরিমাণ শ্রম তাহাকে দিবে। ইহাতে ভালমন্দ বা ভালবাসার কোন নাম গন্ধ নাই। জড়বৎমৃত বা inert dead matter হইয়া মনুষ্য যেন কাজ করিতেছে। ইহা যেন ব্যবসায়ীর লাভালাভ বা commercial value লইয়া গণনা করা হইতেছে। কিন্তু হিন্দুদিগের ভাবটি স্বতন্ত্র। তাঁহারা অপর বস্তুতে ভালবাসা বা আত্মন্ দেখিতে ইচ্ছুক, সেইজন্য তাহারা সকল কার্য্যই ভালবাসার জন্য করিয়া থাকে। ব্যবসায়ী বুদ্ধির দ্বারা কোনও কার্য্য করে না।"

এই রাত্রে স্বামিজী Duty ও ভালবাসা এই ভাবটি অতি বিশদ্‌ভাবে বলিতে লাগিলেন এবং হিন্দুদিগের ভালবাসাই হইতেছে কার্য্যে প্রণোদিত কবিবার ইচ্ছা—ইহা তিনি অতি সুন্দরভাবে

বুঝাইতে লাগিলেন*। পাশ্চাত্যবাসীদিগের শুষ্ক, নীরস, প্রাণহীন ব্যবসায়ী বুদ্ধি দ্বারা যে দার্শনিক ভাব ব্যাখ্যা করা হয়, লাভালাভ খতাইয়া কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা, ইহা পরিহার করিয়া, 'ভালবাসাই হইতেছে কার্য্যের মূল' এই দেবভাবটি তিনি অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে লাগিলেন। নব দেবভাবের বাণীটি শুনিয়া সকলেই বিশেষভাবে মোহিত হইয়াছিল এবং অশুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলের হৃদয় মধ্যে যেন পবিত্র শান্তির ভাব অনুভব করিতে লাগিল। এই ভাবটি পাশ্চাত্যজগতে অভিনব ছিল।

* [Duty শব্দের অর্থ—"That which is due from me"—আমার নিকট হইতে অপরের যাহা প্রাপ্য। পূর্ব্বে আমি কোনরূপে অপরের নিকট ঋণী বা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন উহা পরিশোধ করিতেছি। পাশ্চাত্যজাতি ব্যবসায়ী—সকল বিষয়ে লাভালাভ হিসাব করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে, এইজন্য আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষায় ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সেই বাবসায়ী বুদ্ধি ও ব্যবসায়ীভাব প্রবেশ করিয়াছে। ইহা নিতান্ত নীরস, স্বার্থপর, প্রাণহীন মুমূর্ষু ভাব। ইউরোপের মধ্যযুগে অন্যপ্রকার ভাব ছিল। তখন তাহাদিগের বাণী ছিল—'ভগবান ও ধর্ম্মের জন্য সকল কাজ করিবে।' যদিও ভালবাসা দ্বারা কার্য্যে প্রণোদিত করিবার প্রবৃত্তি স্পষ্টভাবে বিকাশ পায় নাই, তথাপি উক্ত-ভাবটি ব্যবসায়ী বুদ্ধি হইতে বহুপরিমাণে উচ্চভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে ভালবাসাই হইতেছে কার্য্যের মূল। তাহারা ভালবাসার জন্যই কার্য্য করিয়া থাকে। ভালবাসাই হইতেছে ঈশ্বরের অপর একটি নাম এবং নিজেকে অপর বস্তুতে পরিদর্শন করিতেছে—তাই কার্য্য করিতেছে। এই ভাবে কার্য্য করা বা ঈশ্বর সেবার ভাবটি কেবলমাত্র হিন্দুদিগের মধ্যেই ছিল। স্বামিজী এই জ্ঞান ও ভক্তি মিশ্রিত সনাতন তথ্যটি নবভাবে বিকাশ করিয়া দিলেন।

শ্রদ্ধেয় ৺গিরিশবাবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"হিন্দু-দিগের মধ্যে 'Duty' এই ভাবটি নাই। তাহারা কার্য্যের জন্য কার্য্য করিয়া থাকে। ফলপ্রত্যাশা কিছুই করে না। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আপনাকে বিক্রয় করিতে চাহে না। ভালবাসার জন্য ভাল-বাসিয়া থাকে—ইহাই হিন্দুদিগের আদর্শভাব। সকলেই যে এইভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহা বলা যায় না। অতি স্বার্থপর হইয়া বহুলোকই কার্য্য করিতেছে। আদর্শকে ক্ষুণ্ন বা নীচু করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। মানুষ পারুক্ বা না পারুক্ আদর্শ উচ্চ রাখাই শ্রেয়ঃ।] *

কেন আমি অপরের দুঃখে ব্যথিত হই—একদিন বক্তৃতা-কালে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন—"ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই বিষয়ে বহুপ্রকার মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। একশ্রেণীর দার্শনিক বলেন—'ভবিষ্যতে আমার এইরূপ বিপদ হইতে পারে, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য আমি উপস্থিত ব্যক্তির দুঃখে শোক প্রকাশ করিতেছি ও উহা দূর করিবার প্রয়াস করিতেছি।' এতদ্ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য হইতে পারে না।'

অপর এক শ্রেণীর মত এই যে, 'আমি পূর্ব্বে এইরূপই বিপদাপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্মৃতি অদ্যাপিও আমার মনে রহিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যক্তিকে যখন বিপন্ন হইতে দেখি, তখন আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হয়, আমার পূর্ব্ব কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া—বর্ত্তমান ব্যক্তির কষ্টের লাঘব করিতে প্রয়াস করিতেছি।'

অপর আর এক শ্রেণীর লেখক বলেন—'এইরূপ পরস্পর সাহায্য ও উপকার না করিলে, সমাজে বিশৃঙ্খলভাব ঘটিবে। প্রতিবেশীর মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ভাব থাকিবে না এবং একত্রিত হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি হ্রাস হইয়া পড়িবে। এইজন্য সমাজে

* টীকা—গ্রন্থকার।

জীবিত ও তেজস্বীভাব বজায় রাখিতে আমরা পরস্পরে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত আর কোনও কারণ হইতে পারে না।'

এইরূপ বহুবিধ দার্শনিকভাব ব্যাখ্যা করিয়া স্বামিজী এই বিষয়টি বর্ণনা করিতে লাগিলেন; দর্শনশাস্ত্র যে তাঁহার কত গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা ছিল এবং তিনি তাহা কিরূপ উপলব্ধি করিয়া ছিলেন, সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইবার স্বামিজী নিজ মত প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "হিন্দুদিগের ভাব স্বতন্ত্র। তাহারা দেখে যে, প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেক বস্তুর ভিতর একই ব্রহ্মন্ রহিয়াছে। ব্রহ্মন্ই ভিন্ন ভিন্ন আবরণ পরিধান করিয়া সহস্ররূপ ধারণ করিয়া বস্তু, জীব ও প্রাণী হইয়া বিরাজ করিতেছে। আবরণ ভেদে সেই এক ব্রহ্মনেরই বহুত্ব দেখা যাইতেছে। নিজের ভিতর যে ব্রহ্মন্ আছে, প্রত্যেক বস্তুতেও সেই ব্রহ্মন্ রহিয়াছে। যখন কোন বস্তু বা জীবকে ব্যথিত, ক্লিষ্ট বা শোকার্ত্ত দেখি, তখন দেখি যে এই ব্রহ্মন্ই অপর আধারে ক্লিষ্ট হইয়াছে। আমি আমার অন্যরূপে ও ভিন্ন অবস্থায় ক্লিষ্ট হইয়াছি। এই দেহের ভিতর যে ব্রহ্মন্, অন্য বস্তুতেও সেই ব্রহ্মন্। দেশ, কাল ও নিমিত্ত অনুযায়ী ভিন্নরূপ ও ভিন্ন প্রক্রিয়া কিন্তু ব্রহ্মন্ এখানে মূলতঃ এক। সেইজন্য যখন অপর বস্তুকে ক্লিষ্ট দেখি, তখন দেখি যে স্বয়ংই অপররূপে ক্লিষ্ট হইয়াছি। আমি আমারই কষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করি, আমি আমারই শোক অপনয়ন করিবার চেষ্টা করি, আমি আমারই সেবা করি। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অপর বস্তুর ভিতর যে অহং আছে, তাহারই অনুরূপ বা প্রতিবিম্ব বা অংশ অপর আধারে আছে, তথায় সে ব্যথিত হইয়াছে, সেইজন্য আমার অন্তরটা ব্যথিত হয়। আমি আমারই সেবা করিয়া থাকি, আমি আমারই পূজা করিয়া থাকি—ইহাই হিন্দুদিগের ব্যাখ্যা।"

স্বামিজী অহং জ্ঞান বা অহং প্রতিবিম্ব বা self-reflection এই ভাবটি সেই রাত্রে এমন উচ্চকথা দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে, সকলেই যেন দ্রবীভূত হইল। সামান্য ভাষায় বা অল্প বুদ্ধি দিয়া উহা প্রকাশ করা যায় না। বিষয়টি চিন্তা করিবার, ধ্যান করিবার, উপলব্ধি করিবার বস্তু, ভাষা ও তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝিবার নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিক হইতে হিন্দুদিগের মতটি কত উচ্চ—স্বামিজী তাহাই দেখাইলেন; তাঁহার গভীর ও উচ্চভাবের কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র এইস্থানে প্রদত্ত হইল।

পারম্পর্য্য বা ক্রমন্বয় তথ্য বা Theory of Continuity—একদিন বক্তৃতাকালে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, "সমস্ত সৃষ্টিটাই হচ্ছে একটা Continuity বা পারম্পর্য্য বা ক্রমন্বয়। এক বস্তু স্থূল দেখিতেছি, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম অংশ তাহাকে আবরণ করিতেছে। এই সূক্ষ্ম অংশ অতি সূক্ষ্ম হইয়া অপর বস্তুতে বাস করিতেছে এবং পরিশেষে সমস্ত সৃষ্টি ব্যোম বা নভঃস্থল পর্য্যন্ত স্পৃষ্ট বা সংযুক্ত রহিয়াছে। আমি বিভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন এই ভাবটি আসিলেই—মনুষ্য হৃদয়ে ভীতি বা বিষাদের ভাব আসে। আমাদিগের দুর্ব্বলতাহেতু অনেক সময় বুঝিতে না পারিয়া, আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছি, অসংলগ্ন রহিয়াছি, এই ভাবটি মনে আসিয়া ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়। কিন্তু যখন দেখি যে আমি স্থূলভাবে রহিয়াছি, আমি সূক্ষ্মভাবে অপরকে স্পর্শ করিতেছি, সম্মিলিত হইতেছি, এবং ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইরা সমস্ত ব্যোম, নভোমণ্ডল, সৌর-জগৎ ও তাহার বহির্ভাগ বিশাল সৃষ্টিমণ্ডল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি—তখন প্রাণে আনন্দ আসে, সাহস আসে। এক দেহ ধ্বংস হইলে, আমি অপর দেহেতে রহিয়াছি। এক দেহের ধ্বংস মানে, কোন বিশিষ্ট কেন্দ্রের পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইল; কিন্তু অপর কেন্দ্রে সেই সকল পরমাণু সংযোজিত হইল—এই ভাবটি আসিলে মৃত্যু বা দেহ নাশের জন্য কোনও শঙ্কা আসে না। পক্ষান্তরে এক

অবয়ব রূপান্তরিত হইয়া অপর অবয়ব বা রূপ সৃষ্টি করিতেছে। এই স্পন্দন বা হিল্লোল সমস্ত সৃষ্টিমধ্যে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং সৃষ্টি বা অবয়ব নির্ম্মাণ এইরূপেই হইতেছে। এই স্পন্দন বা হিল্লোলের মধ্যে কোন স্থান অপূর্ণ বা void থাকিতে পারে না, Nature abhors Vacuum—এইজন্য সমস্ত জিনিষই continuity।" স্বামিজী theory of continuity অতি সুদীর্ঘভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

* [শ্রদ্ধেয় ৺গিরিশবাবু তাঁহার কবিতার একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন—"সূক্ষ্ম স্থূল প্রসবিনী, স্থূল পুনঃ—সূক্ষ্মেতে মিলায়।" এই সূক্ষ্ম বস্তু ধারাবাহিক হইয়া স্থূল বস্তু হইয়াছে, এবং স্থূল বস্তু বিশ্লেষিত হইতে হইতে পুনরায় সূক্ষ্ম বস্তু হইতেছে। নিরন্তর এই গতাগতি চলিতেছে। ব্যবধান বা শূন্যত্ব কোনও স্থানে নাই। কারণ শূন্যত্ব বা অপূর্ণত্ব কোন স্থানে হইলেই নিকটস্থ অণুরাশি বা শক্তি আসিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া দিবে। বৈজ্ঞানিক মতে ঝড়ের উৎপত্তির কারণ এইরূপ ঃ—'কোনও স্থানের বায়ু সূক্ষ্ম হইয়া উর্দ্ধে গমন করিলে নিকটস্থ বায়ুরাশি অতিবেগে আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়া থাকে। এইজন্য সাধারণভাবে বায়ু সঞ্চালন দ্রুতগতিতে হইয়া থাকে। ইহাকে ঝটিকা বা প্রবলবাত্যা বলা হয়।' এই ক্রমন্বয়তত্ত্ব বা theory of continuity দার্শনিক মতের একটা প্রধান উপকরণ। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ একটাকে স্থূল বস্তু ও অপরটাকে শক্তি বলিতেছে—'Matter and Energy' এবং matter কি তাহাও বলিতে পারিতেছে না, এবং energy কি তাহাও বলিতে সক্ষম হইতেছে না। এই দুইটি অজ্ঞেয় বস্তু স্বীকার করিয়া লইলে সমস্ত তর্ক যুক্তি চলিতে পারে। কিন্তু স্থূলবস্তু বা matter বা energy যে কি প্রকার বস্তু, তাহার বিষয় তাহারা কিছুই বলিতে পারিতেছে না, এবং এই দুইটার মধ্যে একটা gap বা শূন্যত্ব স্বীকার করিতেছে। এই শূন্যত্ব অতিক্রম করিতে তাহারা কোনও একটা

সেতু পাইতেছে না। এইজন্য ইউরোপীয় দার্শনিক মত হিন্দুদিগের নিকট তত মনোজ্ঞ হয় না; কিন্তু theory of continuity বা ক্রমন্বয়ভাবটি অবলম্বন করিলে, ব্যাখ্যা অতি সরস হয় এবং বহু জটিল বিষয়ের অর্থ অতি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়। Chance fallen বা এই জগৎটা হঠাৎ সৃষ্টি হইল বা arbitrary will বা কোনও একটা স্বৈরচারী স্রষ্টার ইচ্ছামত সৃষ্টি হইল—যে সকল ভাব Semetic School এর পণ্ডিতগণ প্রচলন করিয়াছে তাহার কোনও আবশ্যকতা থাকে না। এই doctrine of continuityর বা ক্রমন্বয় ভাবটির আমি বিশেষ পক্ষপাতী। অনেকস্থলে ইহার সাহায্যে বহু বিষয় বাখ্যা করিয়া থাকি। দর্শনশাস্ত্রে এই মতটি একটি বিশিষ্ট মত।] *

সর্ব্বত্রই প্রাণ বা Life Everywhere—সেই রাত্রে স্বামিজী 'সূর্য্য হইতে এই ধৃতিমণ্ডল সৃষ্টি হইয়াছে' এই ভাবটির ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন। তিনি ভাবরাজ্যের উচ্চসীমায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"Life everywhere—প্রাণ সর্ব্বত্র। এই সূর্য্য হইতে পৃথ্বী, নভঃস্থল, বায়ু বা ব্যোম, যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, বুঝিতে পারি বা উপলব্ধি করিতে পারি, সমস্তই প্রাণ বা জীবে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম যে কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহার মধ্যে প্রাণ আছে। অণুমাত্র স্থানেও জীবন্ত শক্তি বা প্রাণ রহিয়াছে। যেমন বীজ হইতে (protoplasm) প্রাণ, পরে অবয়ব বিশিষ্ট প্রাণী উদ্ভূত হইতেছে। বায়ুতে প্রাণী বা জীবাণু পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সূর্য্য রশ্মিও ঐরূপ প্রাণে পূর্ণ। ব্যোম, নভঃস্থল ইত্যাদি সর্ব্বস্থানেই প্রাণী রহিয়াছে। বৃহদাকার জীব যেমন পরিবর্দ্ধিত ও সম্মিলিত (developed organism), এই সকল অণুপ্রাণী তদ্রূপ নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে জীবন্ত শক্তি

* টীকা—গ্রন্থকার।

বর্ত্তমান। এইরূপ অণুপ্রাণী সম্মিলিত হইয়া বৃহৎ অবয়ব বিশিষ্ট প্রাণী উৎপন্ন হইতেছে। সমস্ত সৌরমণ্ডল প্রাণীতে পরিপূর্ণ এবং খগোল হইতে এই অণুপ্রাণী বা সূক্ষ্ম প্রাণী অপর খগোলে গমন করিতেছে। সমস্ত সৌরমণ্ডলটি জীবন্ত ও প্রাণবিশিষ্ট। প্রাণহীন কোনও বস্তু হইতে পারে না। আমাদের এই দেহটাও কতকগুলি চেতন জীব-সমষ্টি। আবার উহা বিশ্লেষিত হইলে অন্য বস্তুতে সেই বীজ-সমূহ চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে বীজ পরমাণুসমূহ সর্ব্বত্র গতাগতি করিতেছে।"

স্বামিজীর এই ভাবের ব্যাখ্যাটি অতি উচ্চভাবে বর্ণিত হওয়ায় সকলেই বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্রই যে প্রাণের ক্রিয়া চলিতেছে, ইহা অতি সুন্দররূপে সকলকে তিনি বুঝাইয়া ছিলেন।

একটা স্পন্দন (wave) একস্থানে উঠিলে ব্রহ্মাণ্ডময় উহার গতি হয়—একদিন স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, "একটা wave বা ঢেউ যদি একস্থানে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই ঢেউ বা স্পন্দন ব্রহ্মাণ্ডময় চলিবে। আমরা যদি নিভৃতে কোনও সৎচিন্তা করি এবং সেই চিন্তা যদি প্রবলবেগ বা দৃঢ়ভাব ধারণ করে—তাহা হইলে সেই স্পন্দন ব্রহ্মাণ্ডময় (in the whole creation) চলিবে। এই স্পন্দনের উপরই সৃষ্টিটা চলিতেছে। রূপ ও অবয়ব এই স্পন্দনই সৃষ্টি করিতেছে এবং সমস্ত সৃষ্টিটা ইহাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে (a compact mass)। এইজন্য একস্থানে স্পন্দন উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র উহা চলিবে।"

গত কয়েকদিন তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। সেইজন্য ঐ সকল দিনে তিনি যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা বৈজ্ঞানিক ধারা অনুযায়ী হইয়াছিল। কারণ দেখা যাইত—যখন তিনি যেভাবে বিভোর হইতেন, তদ্ভাবানুযায়ী লেক্‌চার দিতেন। ভক্তিভাবে পূর্ণ থাকিলে ভক্তির বিষয় কথা বলিতেন। জ্ঞানের ভাবে পূর্ণ থাকিলে, জ্ঞানের কথা বলিতেন। শৈশবে মাতামহী বা

প্রমাতামহীর (ঝিমা) নিকট যে সকল গল্প শ্রবণ করিয়াছিলেন, কখনও কখনও সেই গল্পগুলি আবৃত্তি করিতেন, কিন্তু ব্যাখ্যা ও প্রয়োগপ্রণালী তাঁহার স্বতন্ত্র ছিল। তিনি সর্ব্বদাই আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। নীচভাব বা নীচচিন্তা করিবার তাঁহার আদৌ অবসর থাকিত না। ভাব ও ভাবুক স্বয়ং যেন উভয়েই এক হইয়া যাইত। দুইটির ভিতর কোন্‌টির যে প্রাধান্য হইত তাহা বলা দুষ্কর, কারণ স্বামিজী তখন তন্ময় হইয়া কথা বলিতেন।

* [এই স্পন্দনবাদ কথাটি এত উচ্চ যে দর্শন ও বিজ্ঞান এই স্থলে একত্র সংমিশ্রিত হইয়া যায়। উভয় শাস্ত্রই স্বীয় ব্যক্তিত্ব পরিহার পূর্ব্বক অপর শাস্ত্র বা পরোক্ষানুভূতি অবস্থায় (direct perception বা super sensuous state) উপনীত হয়। এই স্পন্দনবাদ বা vibration theory অতি প্রাচীন মত এবং পৃথিবীর বহু জাতির দার্শনিকদিগের মধ্যে ইহা প্রচলিত ; এই স্পন্দন হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে। Energy-theoryর ইহাই রূপান্তর। সাম্য-স্পন্দন বা rythmical vibration হইলেই আমরা আনন্দ বা পূর্ণত্ব বোধ করি। অসাম্য-স্পন্দন বা unrythmical বা discordant vibration হইলেই আমাদিগের কষ্ট হয়, কলহ-বিবাদ বা অশান্তি হয়। Pythagorian-রা এই rythmical vibrationকে Harmony বলিত। আমরা যে সকল কার্য্য করি, যাহা চিন্তা করি, যাহা ধ্যান করি, সেই সব স্পন্দনের উপর নির্ভর করে। Undifferentiated mass of Energy বা অবিভক্ত শক্তিরাশি আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ চিন্তাযন্ত্র বা instrument of observation নিজেই স্পন্দনময়। এইজন্য যখনই আমরা কোন স্পন্দন দেখিতে পাই তখনই আমরা শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি এবং মন দিয়া ক্রমশঃ যত উর্দ্ধে আমরা চিন্তা করিতে পারি ততই স্থূল হইতে সূক্ষ্মের চিন্তা করিয়া থাকি, ইহার অতীত যাহা তাহা আমরা চিন্তা করিতে পারি না, কারণ স্বয়ং তখন তাহাতে আমরা পরিণত

হইয়া যাই। স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম অনুযায়ী এই স্পন্দন অবিরাম চলিতেছে, এবং বিভিন্ন স্পন্দন হইতেই দেশ, কাল ও নিমিত্ত জ্ঞান-বোধ হইতেছে। সময় বা কাল যাহা আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি তাহাও স্পন্দন। সমগুণান্বিত স্পন্দন একীভূত হওয়ায়—অবয়ব হইতেছে। বিষমগুণান্বিত স্পন্দন একীভূত হইলে বস্তুর হ্রাস বা ধ্বংস হয়। প্রত্যেক পরমাণুরই স্পন্দন রহিয়াছে। পরমাণু হইতেছে অব্যক্ত ও ব্যক্তের সন্ধিস্থল বা "atom is the tie-knot between the mental and the physical planes." ইহাদের অবস্থিতি বিজোড় গ্রন্থির ন্যায় এবং উহাদের সংযোগ বিভিন্ন স্পন্দনের উপর নির্ভরশীল। স্পন্দনে বিপরীত ধারা হইলে উহারা সান্নিধ্য অবস্থা ত্যাগ করিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এই দেহটাও কতকগুলো পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। উহারা স্পন্দন দ্বারা সান্নিধ্য বা একীভূতভাবে রহিয়াছে এবং উহার ব্যতিক্রম বা বিপর্যস্ত হইলেই দেহ তখন বিশ্লেষিত হইয়া যায়। এইরূপে সমস্ত সৃষ্টিকার্য্য স্পন্দনের উপর চলিতেছে। আবার এই সৃষ্টিটাও একটা Compact mass বা চাপ বা জমাট বস্তু—ব্যবধান বা ব্যতিক্রম কুত্রাপি নাই। কেবলমাত্র স্থূল, সূক্ষ্ম বা মহাসূক্ষ্ম এইমাত্র প্রভেদ। এই জন্য স্বামিজী বলিয়াছিলেন "একস্থানে স্পন্দন করিলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই স্পন্দন চলিয়া যায়"। হিংস্রচিন্তা, বা নীচচিন্তা (destructive ideas বা low ideas) বহুদূর ব্যাপী হইতে পারে না। কারণ, উহারা Negative ideas—positive ideas নহে। Unrythmical ideas বলিয়া বহুদূর ব্যাপী গতি উহাদের হইতে পারে না। এই কারণেই সাম্য-স্পন্দন বা rythmical ideas বহুদূর ব্যাপী ও চিরস্থায়ী হয়। একটি কথা আছে—"High thoughts are possible in the mind, when the clamour of the mind is subsided ; Virgin thoughts only he can conceive whose mind is

not dragged by opposite tendencies"—অর্থাৎ,—"মন যখন শান্ত, স্থির, তখনই উচ্চচিন্তা সম্ভবপর হয়, অসংযমী চিত্তে যখন দ্বন্দ্বভাবের খেলা চলে, তখন নব উদ্ভাবনের আশা করা বৃথা।"

স্পন্দনবাদ অতি মহান ও বিশাল ব্যাপার। এই ভাবটি ব্যাখ্যা করিতে বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইস্থলে ইহার সামান্য উল্লেখ করা হইল। ইহা চিন্তা করিবার বিষয়, ধ্যান করিবার বস্তু, শব্দ বিন্যাস দিয়া পড়িবার নহে।] *

সৃষ্টিতে নূতন আর একটি বস্তুও রাখিবার স্থান নাই— গভীরভাবের সহিত একদিন স্বামিজী বলিতে লাগিলেন—"সৃষ্টিটা সমস্তই একটা undifferentiated mass of enregy বা অবিভক্ত শক্তি রাশি। নূতন একটা বস্তু যদি সৃষ্টির বাহিরে তৈয়ারী করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টি মধ্যে উহা রাখিবার স্থান নাই। কারণ সৃষ্টিটা সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ, বিচ্ছেদ বা ব্যবধান কুত্রাপি নাই"। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিলেন—'একটা পিপা জলেতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে যদি আর এক বিন্দুও জল রাখিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে উহা ফাটিয়া যাইবে কারণ, উহাতে নূতন আর একটু জলও রাখিবার ব্যবধান নাই।' সেইজন্য এই সৃষ্টিমধ্যে আর একটি বস্তু বহির্জগৎ হইতে আনিয়া রাখিবার স্থান নাই। যদি রাখা হয় তৎক্ষণাৎ উহা ফাটিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। কারণ শক্তি বা Energy সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।" এই ভাবটি স্বামিজী এত গভীর ও উচ্চভাবে বলিতে লাগিলেন যে, সকলেই স্তম্ভিত হইল।

* [আমাদিগের Sense-bound world বা ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ—স্থূল, সূক্ষ্ম, বা অতিসূক্ষ্ম ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বদা শক্তির ভিতরই সঞ্চরণ করিতেছে। সৃজিত সকল বস্তুই চঞ্চল

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

শক্তির (energy in motion) নানাঅবস্থার বিশ্লিষ্ট শক্তিরেখা (differentiated rays of energy) হইতে সংমিশ্রিত হইয়া রূপ বা অবয়ব ধারণ করিতেছে এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ অবয়ব অবলম্বন করিয়া শক্তির ভিতরেই সঞ্চালন করিতেছে। কখনও কখনও সংঘর্ষণ করিয়া পূর্ব আয়তন পরিবর্তন করিয়া অপর আয়তন বা রূপ ধারণ করিতেছে। কিন্তু সমস্তই শক্তি—ব্যক্ত বা অব্যক্ত যে ভাবেই শক্তি হউক না কেন, সবটাই শক্তি (both differentiated and undifferentiated energy)। এইজন্য যদি অপর জগৎ হইতে অল্পমাত্র একটি অণুও এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার থাকিবার স্থান নাই। ইহা একটি suppositional problem, Energy বুঝাইবার জন্য সুবিধা হয়। Energy theory অতি বিশাল, অল্পস্থানে বলা সম্ভব নয়।] *

একটি ঢিল ছুঁড়িলে পুনরায় উহা পূর্বস্থানে ফিরিয়া আইসে—স্বামিজী এই কথাটি প্রায়ই বলিতেন যে যদি একটা উপলখণ্ড শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং লোকটি যদি জীবিত থাকিতে পারে, তাহা হইলে উহা পুনরায় তাহার হস্তে ফিরিয়া আসিবে। কারণ, motion বা গতি বর্তুলাকারে হইয়া থাকে। যদি পথিমধ্যে কোন প্রতিবন্ধক বা retardation না ঘটে, তাহা হইলে গতি বর্তুলাকারে প্রধাবিত হইয়া পুনরায় নিজকেন্দ্রে প্রত্যাগমন করিবে। কারণ গতি কখনও straight line বা সরল রেখায় হয় না।

* [সমস্ত গতিই বর্তুলভাবে (curvature) চলিতেছে। পক্ষান্তরে ইহাকে তির্যগ্ গতি বলা যাইতে পারে। যাহাকে আমরা straight line বলিয়া থাকি, ইহা প্রকৃতপক্ষে shortest part of a curvature। গতি বা motion অনবরত স্পন্দিত হইলে curve বা বর্তুল সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাবে আমরা

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

'সমক্ষেত্র' এই কথা ব্যবহার করি। কিন্তু পৃথিবী একটা বড় curve এবং তাহার প্রত্যেক অংশও curve এবং পৃথিবীর গতিও একটা বড় curve (elliptic path)। সমস্ত সৌরজগৎ যখন motion through the spaceএ যাইতেছে, তখন উহাও একটা বিরাট curve, কারণ acceleration হইলেই উহার retardation হইবে এবং উভয়ে মিলিয়া parallelogrm of forceএ পরিণত হইবে অথবা centrifugal force হইলে centripetal force তাহার সহিত থাকিবে। এইরূপে curvatureএর সৃষ্টি হয়, straight line কখনই হইতে পারে না। যে কোন lineই আমরা prolong করি, তাহা curve হইবে। কারণ energyর উহার সহিত সংমিশ্রণ আছে। যাহাকে আমরা circle বলি, তাহারও দ্রুতগতি (rapid gyration) হইলে একটা ellipseএ পরিণত হয় এবং উহাতে দ্রুতগতি energy সংযোগ করিলে ক্রমে parabolla হইয়া যাইবে। ইহাকে বলে Motion বা Energy theory। এবং motion প্রথম অবস্থায় circle or ellipse হওয়ায়, energyটা through transition পুনরায় নিজকেন্দ্রে ফিরিয়া আসিবে (back to its centre)। কিন্তু এইস্থলে Energy বা Motion theoryর ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক নাই। ইহা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। ইহা উল্লেখ করিয়া দেখান হইতেছে যে স্বামিজী science এর বিষয় কত গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন এবং theory of curvature কত উত্তমরূপে আরও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল মাত্র একজন দার্শনিক ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু scienceএ ও তদ্রূপ নিপুণ ছিলেন। Motion Theory অতি গভীর বিষয়, সাধারণের পক্ষে অতি দুর্বোধ্য, কেবলমাত্র কোবিদগণের বোধগম্য হইবে।] *

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

শক্তির প্রত্যেক বিন্দুই কেন্দ্র, বিশেষ কেন্দ্র কুত্রাপি নাই—যখন কয়েকদিন Energy বা শক্তির বিষয় খুব লেকচার চলিতেছিল, স্বামিজী ঐ বিষয়ে মাতোয়ারা হইয়া একদিন অতি উচ্চ অবস্থায় চলিয়া যাইলেন। বিভক্ত বা খণ্ড-শক্তির বিষয় বা জ্ঞান ত্যাগ করিয়া একেবারে অবিভক্ত বা অখণ্ড সর্বব্যাপ্ত শক্তির ভাবে উপনীত হইলেন। তখন সান্নিধ্য বা দূরত্ব জ্ঞান আর কিছুই থাকিল না। একটা অপরিধি সর্বব্যাপী শক্তির কথা তিনি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এত উচ্চ ভাবের কথা হইতে লাগিল যে সমস্ত বুঝিতে পারা গেল না, কারণ ঐ বিষয় গভীর ধ্যান ও উপলব্ধির বিষয়। তিনি বলিতে বলিতে আরও উচ্চে চলিয়া যাইলেন এবং অবশেষে সর্বব্যাপী শক্তির একটা লক্ষণ নির্ণয় করিয়া দিলেন, তিনি বলিলেন, 'Every point is a centre, but nowhere is the centre', অর্থাৎ, এই অখণ্ড, অবিভক্ত শক্তির প্রত্যেক বিন্দুটিই একটি কেন্দ্র, কিন্তু বিশেষ কেন্দ্র কোন স্থানেই নাই। এই অভিনব বাণী তিনি ঐ রাত্রে বলিয়াছিলেন। এই বিষয়টি তিনি নানা ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু অত্যন্ত জটিল বলিয়া সমস্ত ধারণা করা গেল না, আভাস মাত্র যাহা স্মরণ আছে, তাহাই এইস্থলে লিখিত হইল।

* [সমস্ত গতি বা বিকাশমুখী শক্তি যাহা যে কোন বস্তুতেই বা ধারাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এক কেন্দ্র হইতেই সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই কেন্দ্র ব্যতীত অপর স্থান হইতে গমনমুখী শক্তি সঞ্চালিত হয় না। যে দিকে, যে প্রকারে, যে কোন স্থানেই শক্তি পরিচালিত হয়, সেই পরিধির অন্তর্গত বস্তুর আভ্যন্তরিক শক্তি একই কেন্দ্র হইতে সঞ্চালিত হইতেছে। তজ্জন্য প্রত্যেক বস্তুটির একটিমাত্র কেন্দ্র (monocentric) থাকে। পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা আমরা দেখিতে পাই, বুঝিতে পারি, সমস্তই এক কেন্দ্রাধীন। যে সমস্ত বস্তুর dimension বা পরিধি

জ্ঞান হয়, তাহা monocentric। পরিধি অর্থে তিনগুণ বোঝায়—length, breadth and thickness—এই তিনগুণ ব্যতীত আমরা কোন বস্তুর রূপ বা আয়তন চিন্তা করিতে পারি না। ইহাকেই আমরা জড় বা সীমাবদ্ধ বস্তু বলিয়া থাকি। কিন্তু মন যখন এই গুণত্রয়াতীত হইয়া নির্গুণ গুণময় অবস্থায় উপনীত হয়, ব্যক্ত অতিক্রম পূর্বক অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, স্বীয় দেহ, চিন্তা ইত্যাদি জ্ঞান লোপ পাইয়া কেবলমাত্র দ্রষ্টাস্বরূপ অবস্থায় বর্তমান থাকে, তখনই খণ্ডভাব ত্যাগ করিয়া অখণ্ডভাবে চিৎশক্তি প্রতিভাত হয়। এই সময়ে চিদাকাশ প্রতিভাত হয় এবং ইহাকেই 'অখণ্ড-শক্তি' বলা হয়। পরে যখন আবার সেই শক্তি সৃষ্টিমুখী হইয়াছে, বা বিভক্ত হইবার প্রয়াস করিয়া dimension বা পরিধির ভিতর আসিয়া বিশেষরূপ ধারণ করিতেছে, তাহাকে 'চিদাভাস' বলা হয়। চিদাভাস হইতে চিৎশক্তি প্রথম গুণসংযুক্ত হইলেই রূপ বা অবয়ব বা dimensionএ রূপান্তরিত ও প্রতিবিম্বিত হয়। এইজন্য চিদাভাসে আমরা রূপ কল্পনা করিয়া থাকি। এইস্থানে বলা যাইতে পারে—"Concept is a concrete one". অধ্যাস বা self projection এই স্থানে প্রতিফলিত হয়। সাধারণতঃ আমরা উর্দ্ধদিকে মন তুলিয়া চিদাভাস পর্যন্ত যাইতে পারি, কারণ ঐ স্থান পর্য্যন্ত আমাদিগের পরিধিজ্ঞান বর্তমান থাকে। কিন্তু যখন ঐ dimensionএর একটি গুণ—length, breadth and thickness—লয়প্রাপ্ত হয়, তখন আমাদিগের চিন্তাশক্তি বা চিত্তাকাশ বিলুপ্ত হইয়া যায়। চিত্ত আকাশ লয় পাইয়া চিৎআকাশ অহং বিকাশ করিবার প্রয়াস করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এই স্থলেই লোক বিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং সমস্তই এক মহাশূন্য, অস্তিত্ববিহীন, সত্তাশূন্য, জড়, মৃত অবস্থা বলিয়া ভীত হইয়া এই স্থানটি ত্যাগ করিয়া থাকে। কারণ, মনের অভ্যাস গুণ দেখা, নির্গুণ অবস্থাতে গমন করিতে অনভ্যস্ত। এইজন্য স্বামিজী

পুনঃ পুনঃ বলিতেন, যে এই স্থান হইতেছে—Point of Polarisation বা কেন্দ্র বিপর্যস্ত স্থান; এক কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া অপর একটি কেন্দ্রে গমন করিতেছে। ইহাকে মৃত্যু বা শূন্যত্ব বা জড়ত্ব বলা চলে না; ইহা প্রকৃত প্রাণে পরিপূর্ণ। প্রকৃত জীবন এইস্থানে। মহাপ্রাণ এইস্থানে লাভ হয়। এইজন্যই ইহাকে চিদাকাশ বা আকাশোপম বলা হয়।

যাহাকে আমরা চিদাভাস বলি, সেই সৃষ্টি অভিমুখী শক্তিতে তখনও পর্যন্ত আমাদিগের এক কেন্দ্র জ্ঞান বর্তমান থাকে। যাহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু কল্পনা-সাহায্যে যাহার তিনটি dimensions ও একটি কেন্দ্র আছে—অনুমান করিয়া লই, সেই ভাব পরমাণু শব্দের সহিত জড়িত। কিন্তু এক কেন্দ্রে ভাব বিচূর্ণ হইলে, সহসা মন এক অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, নিজের সত্ত্বা আছে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব আছে কি না জ্ঞান থাকে না—এই স্থানটিকে 'চেতন সমাধি' বলা হয়।

এই বিষয়ে বহুপ্রকার মত আছে। একমত বলে, সত্ত্বাও থাকিবে, ব্যক্তিত্বও থাকিবে (Existence and Individuality)। অপর মত বলে সত্ত্বা থাকিবে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব থাকিবে না—(Existence and Universality)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদিগের যে সকল বস্তুর পরিধি-জ্ঞান আছে, তাহারা কেন্দ্রীভূত। কিন্তু এই স্থানটি ত্রিগুণাতীত। এইজন্য ভাষায় বলিতে হইলে, অপরিস্ফুটভাবে এই মাত্র ইঙ্গিত করা যাইতে পারে যে, এইস্থলে প্রত্যেক বিন্দুই হইতেছে কেন্দ্র এবং বিশেষ একটি কেন্দ্র কুত্রাপি নাই। কারণ এইস্থলে সৃষ্টি nascent বা অপরিস্ফুটভাবে বর্তমান রহিয়াছে। বিশেষ কোনও বস্তু বা ভাব বা চিন্তা কিছুই বলা যাইতেছে না, অথচ এইস্থলটি হইতেছে Dynamic centre—সৃষ্টি বা পরিচালনকেন্দ্র। ইহাকে অব্যক্ত, অচিন্তনীয় শক্তি-সমুদ্র বলা যায়। কিন্তু ভাষার দ্বারা উহা

প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে গেলেই—উহার সার্থকতা নষ্ট হইয়া যায়। উহা ভাষা দিয়া বলিবার নয়, উহা হইতেছে গভীর ধ্যানের বিষয়, তর্ক-বিতর্কের বস্তু নয়।] *

Professorএর-কথা—এই বিষয়টি স্বামিজী একটি professor বা অধ্যাপকের ঘটনাদ্বারা বুঝাইয়াছিলেন। সে তাহার যন্ত্রাদি লইয়া কোনও বিষয়ে experiment করিতেছিল। তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য অতিক্রম পূর্বক সহসা নূতন এক বস্তু দেখিতে পাইল—যেন কোনও অদৃষ্টপূর্ব সত্য সম্মুখে দণ্ডায়মান। ক্ষণিক স্থির, নিশ্চল, নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিতে লাগিল "সবই এক মহাশূন্য!" স্বামিজী বলিলেন, "সাধারণে পূর্ণত্ব বিষয়ে বুঝিতে অক্ষম হইয়া উহাকে শূন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।" যাহা স্মরণ আছে, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

হিরণ্যগর্ভঃ—একদিন "হিরণ্যগর্ভের" কথা উঠিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ভাবটি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভগবানের অংশ বা বিকাশরূপে ইহা বহুকাল হইতে পূজিত।

স্বামিজী বলিতে লাগিলেন—ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যবর্তী স্থানটি হইতেছে হিরণ্যগর্ভ। ব্যক্তভাব আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু ব্যক্ত অবস্থা একেবারেই অব্যক্ত অবস্থায় আসে না। এই বিবর্তন অবস্থাকে (State of transition or Point of Polarisation) 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হয়। অব্যক্ত অবস্থা যে কি তাহা আমরা ভাষা, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি উপকরণ দিয়া পাই না, অথচ ইহার সত্ত্বা আছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। মনন বা mentation আভাস রূপে এইস্থলে অব্যক্ত অবস্থাকে সূচিত করে। কিন্তু cogitation বা 'চিন্তন' ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই মধ্যবর্তী স্থানটিকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হয়। স্বামিজী ইহা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

* টীকা—গ্রন্থকার।

* [আমরা (cogitation) চিন্তাক্রিয়া দ্বারা বহুদূর উর্দ্ধে মন তুলিতে পারি। Cogitationএর উপাদান হইতেছে—দুইটি গুণ এবং উভয়ের মধ্যে তারতম্য বা আধিক্য বা হ্রাসত্ব নির্ণয় করিয়া একটির অন্যের উপর আধিক্য বা প্রাধান্য স্থাপন করাই cogitationএর ক্রিয়া। এইজন্য দ্বন্দ্ব অবস্থার ভিতর চিন্তা চলিতে পারে। কিন্তু যখন দ্বন্দ্ব অবস্থা অতিক্রম করিয়া নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় চিৎশক্তি প্রধাবিত হয়, তখন cogitation ধীরে ধীরে লুপ্ত হয় এবং চিৎশক্তি নির্দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় চলিয়া যায় এবং উহা উর্দ্ধাবস্থায় গমন করিলেও ক্ষণকালের জন্য তাহার পূর্বাবস্থার (খণ্ড অবস্থার) স্মৃতি থাকে। ক্রমে যখন অব্যক্ত বা অখণ্ড বা নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় চিৎশক্তি যায়, (যে স্থানে নিজের সত্ত্বা থাকে), সেই অব্যক্ত অবস্থায় দ্রষ্টারূপে অন্যবিধ বিষয় উপলব্ধি করে। কখনও বা সংযুক্ত, কখনও বা বিযুক্ত হইয়া দ্রষ্টা হয়। কারণ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা কখনও লয় হইয়া একীভূত হইতেছে, কখনও আভাসে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইতেছে। কারণ এইরূপ অবস্থাতে সত্ত্বা দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু ইহা অতি অপূর্ব স্মৃতি বা উপলব্ধি বা আত্মদর্শন করিয়া পুনরায় নিম্নগতি বা ব্যক্ত অবস্থায় চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আসিলে, আত্মস্বরূপ বা পূর্ণজ্ঞানের স্মৃতি থাকে। ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে যাইবার একপ্রকার স্মৃতি এবং অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আসিবার অন্যপ্রকার স্মৃতি। এই উভয়-প্রকার স্মৃতির সীমাস্থলকে (line of demarcation) 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হয়। ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়েই মিশ্রিত। ঠিক ব্যক্ত অবস্থা বলা যাইতেছে না, একেবারে অব্যক্ত অবস্থাও বলা যাইতে পারা যাইতেছে না। এই সকল ভাব অতি উচ্চ অবস্থার কথা। স্বামিজী স্বয়ংই ইহা ব্যাখ্যা করিবার এবং অপরকে ধারণা করাইবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইহা গভীর ধ্যানের

বিষয়, শুধু শব্দবিন্যাসে বুঝিবার নহে, তর্ক-বিতর্কের অতীত অবস্থা। মন বা অন্তরাত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে বিদেহ অবস্থায় চলিয়া যায়, অর্থাৎ যখন দেহজ্ঞান পর্য্যন্ত একেবারে থাকে না, বিভিন্ন স্থজিত বস্তুর জ্ঞান যখন লোপ পায়, পার্থক্য ব্যবধান ইত্যাদি জ্ঞান যখন চিৎশক্তি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয়, কেবলমাত্র সত্ত্বা ও অব্যক্ত সৃষ্টি এই ভাবটি থাকে, এবং অহংই সৃষ্টি, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়েই হইতেছে, সেইরূপ অবস্থায় চিৎশক্তি প্রতিভাত হইলে যাহা হয়—তাহাকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হয়। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে এই সকল উচ্চস্তরের বর্ণনা করা অতীব দুরূহ। যাহা কিছু লেকচার কালে শুনিয়াছিলাম এবং অদ্যাপি যাহা কিছুমাত্র স্মরণ আছে, তাহাই এইস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।] *

Cosmic Energy বা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত শক্তি—যখন গত কয়েক দিবস বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপর লেকচার চলিতেছিল, তখন একদিন প্রসঙ্গক্রমে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "The sum total of the Cosmic Energy is the same" অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত যে শক্তি রহিয়াছে—তাহার পরিমাণ সর্বদাই সমভাবে রহিয়াছে। জ্যোতিস্কমণ্ডলের এক অংশ ধ্বংস হইলে, সেই শক্তি অপর প্রদেশে আর একটি খগোল নির্ম্মাণ করিয়া লয়। যদিও এক বস্তু বা জ্যোতিস্ক স্থানচ্যুত হইল, কিন্তু ইহাতে বিশ্বশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইল না। বিশ্বশক্তি অন্যত্র আত্মপ্রভাব বিকাশ করিয়া অন্য একটি জ্যোতিস্ক নির্মাণ করিয়া লইল। স্বামিজী এই ভাবটি বুঝাইবার সময় অতি উচ্চ অবস্থায় চলিয়া যাইলেন, যেন এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে অনন্ত বিস্তৃত স্থানে চলিয়া গিয়াছেন এবং অসংখ্য জ্যোতিস্কমণ্ডলকে কন্দুকের ন্যায় গ্রহণ করিয়া তিনি খেলা করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃগণও যেন অতর্কিত

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

ভাবে সেই বিশাল অবর্ণনীয় স্থানে চলিয়া গিয়াছে এবং পরিধিহীন অনন্ত স্থানে অনন্ত শক্তি কিরূপ ক্রিয়া করিতেছে—যেন সম্যকরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। শ্রোতৃদিগের মনকে নিজের সূক্ষ্ম শরীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া অতি উচ্চস্থানে লইয়া যাওয়াই ছিল স্বামিজীর লেকচারের বিশিষ্টতা। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার লেকচার—শুনিবার বা বুঝিবার বস্তু ছিল না, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যেক ভাবটিকে দেখিবার বিষয় ছিল। আত্মশক্তিতে তাঁহার কথিত ভাবসমূহকে প্রত্যক্ষ করাইবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। স্বামিজী এবং শ্রোতৃগণও সাময়িকভাবে বিদেহ হইয়া ঐ জীবন্ত ভাবরাশি প্রত্যক্ষ করিতেন। এই শক্তিটি স্বামিজীর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং এই কারণেই তাঁহার প্রদত্ত লেকচার এত হৃদয়গ্রাহী ও হৃদয়স্পর্শী হইত। এইজন্য পূর্ব কথা এরূপভাবে এখনও স্মরণ আছে। তাঁহার 'লেকচার' শ্রবণ করা ও পুস্তক পাঠ করা উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

* [অতি প্রাচীনকাল হইতেই দার্শনিকদিগের প্রশ্ন ছিল—"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য কি?" অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই সিদ্ধান্ত হইল—সমস্তই একটি মহাশক্তি। ইহা শাশ্বত, অব্যয় ও সর্বব্যাপ্ত। ইহার বাহিরে চিন্তা যাইতে পারে না। কারণ, চিন্তাও একটা শক্তি বিশেষ এবং উহা সূক্ষ্ম স্নায়ুর স্পন্দন হইতেই উদ্ভূত। এই বিশ্বশক্তি যদিও নিশ্চল, কিন্তু বর্তমানে দ্রষ্টার মন চঞ্চলভাবে দেখিতেছে বলিয়া, সেই সাম্যশক্তি চাঞ্চল্যপূর্ণ (in a state of commotion)। কিন্তু চিত্ত চাঞ্চল্যভাব পরিহার করিয়া যখন সাম্য (state of equilibrium) ভাবে উপনীত হয়, তখন বিশ্বশক্তির সাম্যভাব উপলব্ধি হয়। কবি ৺গিরিশ চন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন—

"নাহি আর হিল্লোল, কল্লোল,
কালের হিল্লোল স্থির, স্থির সমুদয়,

নহি—নহি, ফুরাইল বাক্,
বর্ত্তমান বিরাজিত।” (পাগলিনী, বিল্বমঙ্গল)

এই বিশ্বশক্তির সাম্যভাব হইতে অধিকারী-অনুযায়ী দ্রষ্টা চাঞ্চল্যভাব লক্ষ্য করে এবং state of commotion হইতেই জ্যোতিস্কমণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে উপনীত হইয়াছে। ইহাকে মহাকারণ, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল বলা যায়। কিন্তু মহা-শক্তিই বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। এইজন্য স্থূলের পরমাণুর মধ্যেও শক্তি চঞ্চলভাবে রহিয়াছে (in agitation)। পরমাণুসমূহ শক্তি দ্বারাই একীভূত বা এক কেন্দ্রে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে—এবং অপর এক বিরাট শক্তিসম্ভূত ঘনীভূত পরমাণু সমষ্টির (solid dense mass of atoms) সন্নিকটস্থ হইলে আকর্ষণী-শক্তিদ্বারা পরমাণু-রাজি পূর্বতন কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া নবাগত বিশাল বস্তুর কেন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয়। ইহাকেই বলা হয় পূর্ব বস্তুটির ধ্বংস হইল এবং নবাগত বিশাল বস্তুটি পরিবর্দ্ধিত হইল। এইরূপে যদিও বিশ্বশক্তি বা cosmic energy এক স্থানে বা এক কেন্দ্রে বিলুপ্ত হইল, কিন্তু সেই শক্তিটা অপর বস্তুতে নিয়োজিত হইল। এইজন্য সমগ্র শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই, কেবল্ মাত্র অবয়ব ও স্থানের (location) পরিবর্তন হয়। এই উচ্চ ভাবটি স্বামিজী অতি সুন্দররূপে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।] *

Conscious, Sub-conscious and Super-conscious Planes—ধ্যানের বিষয় ব্যাখ্যাকালে একদিন স্বামিজী বলিতে লাগিলেন sense-bound world বা ইন্দ্রিয়গোচর জগতে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতেছি—তাহার চিত্র আমাদিগের conscious plane এ অবস্থান করে। প্রতি মুহূর্তে নব নব ভাবরাশি আমার পূর্ব বস্তুজ্ঞান সকল conscious plane হইতে sub-conscious

* টীকা—গ্রন্থকার।

region of the mind এ চলিয়া গিয়া চিরকাল তথায় অবস্থান করে। উপযুক্ত উত্তেজক (fit stimulus) প্রযুজ্য হইলে সেই অন্তর্নিহিত ভাবরাজি পুনরায় conscious plane এ উদিত হয়; super-conscious বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হয়—যখন স্থুল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে, অন্তরাত্মায় বা Inner self এ উপনীত হয়। দেশ, কাল, নিমিত্ত (time, space and causation) যখন দূরীভূত হয়, তখন বস্তু বা ভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। ইহাকেই 'অতীন্দ্রিয়' জ্ঞান বলা হয়।

স্বামিজী বিশেষভাবে বলিতেন, "আমি miracle বলিয়া কোনও বস্তু মানি না। প্রত্যেক ঘটনারই একটা দার্শনিক কারণ আছে এবং ঐ কারণ অনুযায়ী কার্য বা বিকাশ হইতেছে। 'রাজযোগ'ই সূক্ষ্ম কারণ নির্ণয় করিয়া দেয়। যদিও আমি 'রাজযোগের' সকল ক্রিয়া করি নাই, কিন্তু যৎসামান্য যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাতে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি যে ঐ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।" এইজন্য তিনি সর্বদাই বলিতেন—"The book says so"—গ্রন্থে এইরূপ আছে। পূর্বতন যোগিগণ প্রক্রিয়াদ্বারা নিশ্চিত হইয়া ঐ সকল বাণী লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রোতৃ-গণকেও বলিতেন, "Have some gentlemanly faith", অর্থাৎ "আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিতেছি, তাহা ভদ্রলোকের খাতিরে যদি একটু মানিয়া লইয়া কাজ কর, তাহা হইলে অন্যান্য স্তরের কথা বুঝিতে পারিবে।"

"রাজযোগে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি হঠাৎ একটা সত্য পাইয়া (tumbling into truth) miracle বা আজগুবি করিয়া অশিক্ষিত মানবদিগের নিকট মহা হৈ চৈ করিয়া থাকে এবং সাধারণ অশিক্ষিতগণ ঐরূপ কার্যে আশ্চর্যান্বিত হইয়া অদ্ভুত বলিয়া মানিয়া লয়। কিন্তু 'রাজযোগ' হইতেছে scientific system—অর্থাৎ প্রথা। উহার প্রত্যেক dictum বা বাণীটি experiment

করিয়া পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং নূতন ব্যক্তিকেও সেইরূপ experiment বা পরীক্ষা করিয়া যাইতে হইবে। It is a scientific procedure—বৈজ্ঞানিকমতে প্রক্রিয়া, আজগুবি মানিয়া লইবার মত কিছুই নাই, ইত্যাদি।”

* [পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি চিত্র আমাদিগের মনের উপর পড়িতেছে এবং সেই চিত্র সেই কালের জন্য সুন্দর প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কালপর্যায়ে অন্যান্য বহুবিধ চিত্র আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত হওয়ায়, আমাদের পূর্ব চিত্ররাশি নিম্নস্তরে চলিয়া যায়, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় না। যাহাকে আমরা ‘বিস্মৃতি’ বলি, তাহা চিত্র বা ঘটনার জ্ঞান নিম্নস্তরে চলিয়া যাইলে ঘটে। এইজন্য সহসা তাহা উদ্ভূত করিতে পারা যায় না। এইরূপে বহুচিত্র ও বহু জ্ঞান আমাদিগের মনোমধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু উপযুক্ত উত্তেজক (fit stimulus) প্রযুক্ত হইলে ঐ সুষুপ্ত চিত্র বা বস্তুর জ্ঞান পুনরায় প্রকাশমান হয়। ইহাকে বিস্মৃতি হইতে স্মৃতিপথে আনয়ন করা বলে। পক্ষান্তরে একটি কথা বলা যাইতে পারা যায় যে, প্রত্যেক স্নায়ুতে এক একটি ভাব বা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান সংলগ্ন আছে। স্নায়ু নানাপ্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম ইত্যাদি (gross, fine, attenuated nerves, etc.)। আবার এত সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে যে, তাহার অস্তিত্বের সাধারণভাবে আমাদিগের জ্ঞান নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের স্নায়ু বহির্জগতের এক একটি ভাব বা জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে। “Grosser the vibration, shorter is the range and finer the vibration, longer is the range.” স্থূলভাবসমূহ স্থূল স্নায়ু ধারণ করে, অতি সূক্ষ্মভাব অতি সূক্ষ্মস্নায়ু পোষণ করে। এইজন্য বিপরীত উত্তেজক প্রয়োগ করিলে, অন্তর্প্রোথিত ভাবরাজি বা শক্তির স্পন্দন প্রতিবিম্বিত হয়। কারণ, ভাবরাশি হইতেছে শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন মাত্র। এইজন্য আমাদিগের

বহু পুরাতন ও পূর্বতন স্মৃতি আবশ্যকমত পুনর্বিকাশ করা যাইতে পারে।

জীবনে এরূপ ঘটনা সময় সময় হয় যে, আকস্মিক কোনও একটা চিত্র বা জ্ঞান বা সংস্কার আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল, যাহার স'হত বর্তমান অবস্থার কোনও সম্পর্ক নাই। তখন মনে প্রশ্ন উদয় হয়—"এইটা কিরূপে হইল?" বর্তমান স্থূল শরীরের মধ্যে পূর্ব পূর্ব দেহের অংশ সকল সূক্ষ্ম শরীরে থাকে। অর্থাৎ কতকগুলি সূক্ষ্মস্নায়ু আমরা যেমন পূর্ব পুরুষদিগের শরীর হইতে লাভ করিয়া থাকি, সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীর হইতে অতি সূক্ষ্ম স্নায়ু আমরা পূর্বজন্ম হইতে লইয়া আসি। এইজন্য কখনও কখনও আকস্মিকভাবে পূর্ব কথা স্মরণ হয় এবং উহা সত্য হয়। যথা, স্বামিজী বরাহনগর মঠে প্রথম অবস্থানকালে একদিন সারদানন্দস্বামীর বাড়ীর দ্বারে গমন করিয়াই গৃহাদির সমস্ত বিষয় বলিয়াছিলেন। ইহাকে 'second sight' বলা হয়। প্রত্যেকের জীবনে এইরূপ ঘটনা হয়, কিন্তু কেহ তাহা স্মরণ রাখে না। এইস্থানে দেশ কাল ও নিমিত্ত নামে যে অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক আছে, তাহার ক্রিয়া চলে না। স্থূলস্নায়ুর উপর এই অন্তরায়ের ক্রিয়া প্রবল হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম স্নায়ুর বা অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুর উপর এই অন্তরায়ের ক্রিয়া তত প্রবল নয়—ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসে। এই নিমিত্ত বহুকালের পুরাতন স্মৃতিসকল প্রত্যক্ষ করিয়া বর্তমান মুহূর্তের প্রক্রিয়া দ্বারা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। যাহার কর্ণের স্নায়ু প্রবল, তাহার কর্ণেতেই এই প্রক্রিয়া প্রথমে হইবে (the tympanum will be affected by the oracular nerves)। যাহার চক্ষের স্নায়ু প্রবল—তাহার চক্ষুতেই এই শক্তি প্রথম বিকাশ পাইবে (the opitic nerves and the retina will be first affected)। এইরূপ নাসিকা জিহ্বা ইত্যাদিতে হইবে। (the olfactory nerves in the

nostril)। একস্থানে একটি ইন্দ্রিয়ে এই শক্তি বিকাশ পাইলে, ক্রমে ক্রমে উহা অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহে লক্ষিত হইবে। ইহাই হইল, sub-conscious region হইতে conscious planeএ আসা। অপরটি হইতেছে superconscious বা supersensuous ব্যাপার। যখন চিৎশক্তি বা mind stuff অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুর ভিতর দিয়া পরিচালিত হয়, তখন জগতের পরস্পরের সম্বন্ধ অন্যভাবে দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ নানা বস্তুর এক প্রচলিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম স্নায়ু দ্বারা যখন দৃষ্ট হয়, তখন অন্যপ্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে 'অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান' বলে। অর্থাৎ চিৎশক্তি যখন কারণ শরীরে যায়, বর্হিজগত তখন স্থুল আবরণ পরিত্যাগ করিয়া কারণে পরিণত হয়। এইজন্য কারণ কারণকেই অন্বেষণ করে ও উপলব্ধি করে। ইহাই হইল যোগীদিগের ক্রিয়া।] *

রাজযোগের লেকচার চলিতে লাগিল। খুব জমিয়াছে। পূর্বে স্বামিজী শ্রোতৃগণকে মধ্যে মধ্যে 'ভক্তিযোগের' কথা পৌরাণিক উপাখ্যান দ্বারা বর্ণনা করিয়া বিমোহিত করিতেন। কিন্তু যখন তাহারা উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল, তখন তিনি পুনরায় স্বীয় প্রিয়ভাব—অদ্বৈতবাদের প্রচার ও ব্যাখ্যা করিতে ব্যস্ত হইলেন। 'রাজযোগের' নানান ধ্যান, পন্থা ও নিয়মাবলীর বিষয় যখন প্রথমে বলিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রোতাদিগকে অলক্ষিত ও অজ্ঞাতসারে ধ্যাননিরত করাইয়া ধ্যানের চরম অবস্থায় মনকে তুলিয়া দিতেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি একরাত্রের লেক্‌চারে বলিয়াছিলেন, "I am in the sun. I am in the moon", অর্থাৎ যেমন অহং সূর্যতেও রহিয়াছে, চন্দ্রতেও রহিয়াছে, পৃথিবীর সর্বত্র রহিয়াছে, তেমনি এই শরীরেও রহিয়াছে। এই লেকচারটি অতি

* টীকা—গ্রন্থকার।

উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল এবং তর্কযুক্তির অতীত হইয়া বিরাট ও অতি মহানভাব ধারণ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র দেহস্থিত অহং কিরূপে সর্বব্যাপ্ত হইতে পারে, শ্রোতৃগণ উহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিল। এই ভাবটি ক্রিশ্চিয়ান মতকে অতিক্রম করিয়া নূতনভাব আনয়ন করিল। স্বামিজী আর একদিন বলিয়াছিলেন, "I am a voice without form",—অর্থাৎ আমি বাণী, দেহ নহি। এই বার্তাটি অতি উচ্চস্তরের কথা। যেমন Bible পুস্তকে আছে—'In the beginning was the word and the word was with God, and the word was God'—John লিখিত Gosple এ ইহাই প্রথম ছত্র। ইহা সকলেই পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ইহার বিশেষ অর্থ বুঝিতেন না। স্বামিজীর উক্তি—'I am a voice without form'—Bible উল্লিখিত ভাবটির যেন নূতন ব্যাখ্যা হইল, নব-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, যেন নূতন ভাবরাশি প্রতীয়মান হইল, যেন 'নাদ' বা 'বাণী' কাহাকে বলে—নূতনরূপে সকলে দেখিতে পাইল।

মেঘের উপর স্বর্গ, ভগবান ও এক রাজা—বক্তৃতা করিতে করিতে স্বামিজী ক্রমে ক্রমে অদ্বৈতভাবের চরম সীমায় উঠিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সাধারণের ধারণা যে, আকাশে মেঘের উপর স্বর্গ বলিয়া একটা স্থান আছে, আর সেখানে একজন বাস করে—তার নাম ভগবান। আর সেই ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত সকল কাজ করে। কিন্তু মেঘের উপর যতদূর দৃষ্টি করা যায়, চক্ষু বা যন্ত্র দ্বারা, সর্বত্রই দেখা যায়, শূন্যময়। এমন কোনও একটা স্থান নেই যেখানে স্বর্গ বা একব্যক্তি বসিয়া আছে। যাহাদের মনে বিশেষ দৃঢ়তা নেই, তারাই ঐ আকাশের উপর একটা স্বর্গ অন্বেষণ করে ও তথায় ভগবানকে কল্পনা করে।" পূর্বে এই ভাবটি স্বামিজী নানাভাবে বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু এইবার

ক্রোধদীপ্ত বাণীতে বলিতে লাগিলেন, "স্বর্গটা হইতেছে যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাম্য স্থান এবং তথায় নানা রাজভোগ্য দ্রব্যাদি আছে, যাহা সাধারণে এই পৃথিবীতে উপভোগ করিতে পারে না। এইরূপে লোকে মেঘের উপর স্বর্গ ও ভগবান কল্পনা করিয়া থাকে। যে জাতির এই পৃথিবীতে—রাজসভা, রাজা, অভীপ্সিত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা—সেই জাতি আপনাদিগের জন্য জল, বায়ু ও আবশ্যক বস্তু অনুযায়ী মেঘের উপর স্বর্গরচনা করিয়া থাকে। আমেরিকাতে আদিম জাতিদিগের স্বর্গ-ভোগের ভাব হইল—অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র হইবে, তথায় বহু হরিণ থাকিবে এবং এক একটি হরিণকে বিদ্ধ করা হইতেছে। এইরূপে তিনি নানা জাতীয় স্বর্গ ভোগের ছবি ও স্বর্গ কল্পনা উল্লেখ করিয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে সর্বব্যাপ্ত অব্যক্ত ব্রহ্মই একমাত্র সত্তারূপে শাশ্বত বিদ্যমান। উহা দেশ কাল ও নিমিত্তের অতীত, তথায় অন্তর ও বাহির বলিয়া কোন বস্তু নাই। নিজের ভিতরে যে আত্মা উহাই ব্রহ্ম ও উহাই সর্বব্যাপ্ত।"

* [এক শ্রেণীর দার্শনিক মত এই যে বিভীষিকা বা ত্রাস হইতে ভগবৎ-জ্ঞান উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ, যখন মনুষ্যগণ প্রথমে বন-জঙ্গলে বাস করিত এবং বৃক্ষই একমাত্র বাসস্থান ছিল, তখন তাহারা একদিন দেখিল যে সহসা মহাঝটিকা হইল এবং বৃক্ষাদি সমূলে উৎপাটিত হইল বা তাহারা দেখিল যে উপর হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি বা বজ্র আসিয়া বৃক্ষাদি দগ্ধ করিল এবং জন্তু ও মনুষ্যের প্রাণনাশ করিল। এইরূপে নানা কারণে তাহারা ধারণা করিল যে মেঘের উপর কোনও এক অজ্ঞাত পুরুষ বাস করিতেছেন, মানুষের মত তাহার অবয়ব কিন্তু অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ কষ্ট দিতেছে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ উপশম করিতে হইলে যেমন তাহাকে কিছু আহার্য দিতে হয় এবং আহারাদি করিলে যেমন সেই ব্যক্তি শান্ত হয়, প্রাথমিক

মনুষ্যকুল এইরূপে ভগবানের কল্পনা করিল। এইরূপে মেঘের উপরিস্থিত ক্রুদ্ধ অজ্ঞাত পুরুষ বা ভগবানকে আহার্য দিবার প্রথা প্রচলিত হইল এবং উহাদিগের মাংস ও সুরা প্রিয় আহার্য বস্তু হওয়ায় তাহারা পশু হনন করিয়া এবং সুরাকে পানীয়রূপে সেই অপরিজ্ঞাত পুরুষকে প্রদান করিল। এমন কি, এই ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ উপশম করিতে তাহারা নিজ প্রথম সন্তানগুলিকে বলি দিত। এই শ্রেণীর পক্ষপাতী দার্শনিকগণ বলেন যে Abraham তাহার পুত্রকে Jehovahর নিকট ভয়গ্রস্ত হইয়া ছেদন করিতে গিয়াছিল। একটি অনির্দ্দিষ্ট ও অপরিজ্ঞাত ঈশ্বর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া অসুর বা Asyrian দিগের চিরন্তন প্রথা ছিল। Phoenician দিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথম জাত সন্তান ছেদন করা বহুকালের প্রথা। Abraham, Nineva নগরবাসী, জাতিতে অসুর বা Asyrian হওয়ায় এই মত প্রণয়ন করিয়া দিয়াছিল। কালক্রমে মূল প্রথা অনুযায়ী শিশু ছেদন স্থগিত করিয়া পশু বা মেষ ছেদন প্রথা হইল। এইরূপে কোর্বান বা পশু ছেদন প্রথা প্রচলিত হইল।

আবার একশ্রেণীর দার্শনিকদিগের মত, যেন মৃত পিতৃগণ তাহাদের বংশধরদিগের নিকট আহার্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এইরূপে পরলোক, স্বর্গ ও ঈশ্বর জ্ঞান হইয়াছিল। পিতৃপূজা, দেবপূজা এবং ঈশ্বর, দেবতা বা পিতৃ উদ্দেশ্যে যে আহার্য দ্রব্য দেওয়া হয়, সে সকল এই ভাব হইতেই উৎপন্ন হইল। স্বামিজী এই মতটি বিশেষ পোষণ করিতেন যে স্বপ্নাবস্থায় মৃত ব্যক্তি আসিয়া আহার্য বস্তু প্রার্থনা করিতেছে, এই ভাব স্বর্গ বা ঈশ্বর জ্ঞানের মূল কারণ হইল। এই সমস্ত বিষয়ে নানা তর্ক বিতর্ক আছে। সংক্ষেপে কিছু বলা হইল।

অপর আর একটি মত আছে যে, প্রাথমিক অবস্থায় কুল বা tribeএর একজন দলপতি থাকিত। সেই ছিল দলের সর্বময় কর্তা।

যে সমস্ত কার্য অসমাপ্ত থাকিত বা যে সকল কার্য বা ভোগ্যবস্তু তাহাদের ঈপ্সিত হইত, তাহারা কল্পনা করিত যে মৃত্যুর পর আকাশের উপর কোনও একস্থানে যাইয়া উহাদের অসম্পূর্ণ অভিপ্সিত বস্তুসকল বিনা আয়াসেই ভোগ করিতে পাইবে। এই-রূপে দেখা যায় যে প্রথম অবস্থার কুলনায়কগণ পাদপমূলে শয়ন করিয়া থাকিত। অশ্ব, রথ, হস্তী প্রভৃতি আরোহণের কোন বস্তুই ছিল না, তাহাদের ভগবান আকাশস্থিত ব্যক্তিও তদ্রূপ থাকিত। এইজন্য আদি শব্দ হইতেছে—'দ্যৌষ পিতা' বা আকাশে যে পিতা আছে বা থাকে—"Zeus, Jupiter, Father which are in heaven।"

ক্রমে ক্রমে যখন এই পৃথিবীর কুলনায়কের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, গৃহাদি ও ভোগ্যবস্তু সমূহ অধিক মাত্রায় হইতে লাগিল, আকাশস্থিত প্রতিবিম্বস্বরূপ যে ঈশ্বর, তাহারও সেইরূপ ভোগ্যবস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই মর্তস্থিত কুলনায়ক যেরূপ আত্মরক্ষা হেতু সর্বদা যুদ্ধ করিতেছে, অপর কুলকে পরাজিত করিতেছে, সেইরূপ আকাশস্থিত দেবতা বা ভগবান সতত যুদ্ধে নিরত ও শত্রুদিগকে ধ্বংস করিতেছে। এইজন্য প্রত্যেক কুলনায়ক আপৎকালে ভগবানের শক্তি ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। কালক্রমে যখন কুলনায়ক রাজা হইল তখন তাহার আসক্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল—তাহার তখন অট্টালিকা হইল, অশ্ব, রথ, হস্তী ইত্যাদি বিভব হইল, এবং সেই সঙ্গে তখনই প্রতিবিম্বস্বরূপ আকাশোপরি ঈশ্বরেরও নানা প্রকার ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হইল। মর্তস্থিত রাজার যখন সভার মন্ত্রী, সভাপণ্ডিত, কোষাধ্যক্ষ এমন কি নর্তকী, গায়ক ও বাদ্যকার সম্মিলিত হইল, স্বর্গস্থিত ভগবান বা 'দ্যৌষ পিতার' স্বভাবও ইহার অনুরূপ বা প্রতিবিম্ব হইল। এইরূপে স্বর্গ বা ভগবান, মানুষের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা পরিপূর্ণ করিবার জন্য কাল্পনিক স্থান নির্মিত হইল। ইহুদীদিগের স্বর্গ বর্ণনা পাঠ

করিলে, নেবুকাটনাজারের রাজসভা কিরূপ ছিল তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ একটি রাজসভার অবস্থা অপরটির প্রতিরূপ। প্রাচীন নরওয়েজিয়ান দ্বীপবাসীদিগের স্বর্গের নাম Wallhala বা ওয়াল-হল, তথায় কেবলমাত্র বীরগণের প্রবেশাধিকার আছে এবং তাহারা সুরাপান কালে যুদ্ধে নিহত শত্রুমস্তক (খুলি) পানপাত্র রূপে ব্যবহার করিত। এইরূপে বিভিন্ন জাতির স্বর্গ বর্ণনা ও স্বর্গ কামনা দেখিলে জাতির সুষুপ্ত ভাব, আকাঙ্খা ও ভোগ ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যায়। এইরূপ নানা দার্শনিক মত বহু গ্রন্থে লিখিত থাকায় বাহুল্যজ্ঞানে সবিশেষ বলা হইল না।] *

নাস্তিক হওয়া ভাল, কিন্তু ভক্ত হওয়া ভাল নয়—স্বামিজী অদ্বৈত ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া একদিন রাত্রের লেকচারে অদ্বৈত ভাবের কথা বলিলেন, "It is better to be an atheist than to be a pietist" অর্থাৎ নাস্তিক হওয়া ভাল, কিন্তু আস্তিক হওয়া ভাল নয়।" যে সমস্ত বিষয়ে দুর্বলতা বা অপর কোনও বস্তুর উপর নির্ভর বা সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, স্বামিজী সেই সকল ভাব আদৌ পছন্দ করিতেন না। আত্মার শক্তি বিকাশ বা পরিচয় দেওয়াই তাঁহার লেকচারের মূলমন্ত্র ছিল, pietist বা ভক্ত বলিলে নিস্তেজ বা ভীরু বা অপরের উপর নির্ভরশীল ভাব বোঝায়। দ্বৈতভাবে থাকিলে একের প্রাধান্য ও অপরের গৌণভাব মনে আসে। অদ্বৈতভাবে মুখ্য বা গৌণ কোন ভাবও নাই—সকলেই একীভূত। এইজন্য অন্যের সাহায্য লওয়া বা আশ্রয় লওয়া বা আনুগত্য স্বীকার করা ভাল হইতে পারে না। এই ভাবটি স্বামিজী নানা ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। ভিতরে শক্তি থাকিলে সাহস করিয়া জগতের সামনে লোকে বলিতে পারে যে, ঈশ্বর বিষয়ে তাহার সন্দেহ আছে। ইহা হইল তেজস্বিতার ও শক্তিমত্তার চিহ্ন কিন্তু

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

মুমূর্ষুপ্রায়, ক্রন্দনশীল, হতাশ, তেজহীন ভক্ত জীবন্মৃত হইয়া থাকে, তাহার ভিতর কোন শক্তি নাই। এইজন্য স্বামিজী মুমূর্ষু-প্রায় ভক্তদিগের শ্লেষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কারণ, ভিতরে যদি শক্তি থাকে তাহা হইলে নাস্তিক হইলেও পরে আস্তিক হইতে পারে। কিন্তু নিস্তেজ ভক্তহৃদয়ে এমন সাহস হইতে পারে না যাহাতে সে ঈশ্বরের সত্তা পর্যন্ত প্রশ্ন ও সন্দেহ করিতে পারে। এই তেজপূর্ণ শক্তির ভাব দেখাইবার জন্য স্বামিজী এইরূপ নির্ভীক আদেশ করিয়াছিলেন। দুর্বলতা তিনি অতিশয় ঘৃণা করিতেন এবং স্বয়ং প্রত্যেক কার্যে ও প্রত্যেক ভাবেই সতেজ শক্তিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতেন। দ্বৈতভাব মনে থাকিলেই ভয়, ত্রাস ইত্যাদি ভাব আসিবেই, এবং ভীতি হইতেই ঈশ্বর জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল মাত্র অদ্বৈতবাদের ভিতর ইহার চিহ্ন নাই। ইহাতে মনুষ্যহৃদয়ে সুষুপ্ত তেজ প্রজ্বলিত হয়। বহির্জগতে একজন স্রষ্টা বা নিয়ন্তার ভাব দূর হয়। অহংই অন্তর ও বাহির উভয় স্থলেই বিদ্যমান, এবং অনতিবিলম্বে অন্তর বাহির রূপ কোন শব্দ থাকে না—কেবলমাত্র এক বিরাট অহং সর্বত্রই বিরাজমান থাকে। ভীতি বা ত্রাস—কোনও নীচভাব থাকে না। সাধারণে ত্রস্ত বা বিহ্বল হইয়া এই উচ্চ ভাবকে নাস্তিক ভাব বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইস্থলে নাস্তিক বা আস্তিক ভাব কিছুই নাই। ইহা নাস্তিক ও আস্তিক ভাবের উপর—এক সত্ত্ব সর্বত্র বিদ্যামান। কিন্তু ভক্তিতে একীভূত ভাব হইতে পারে না। একটা হীনতা বা অধীনস্থ ভাব সর্বদা বর্তমান, উহাতেই দুর্বলতা বা ভীরুভাব উৎপন্ন করে। স্বামিজী এই ভীরুভাব বর্জন করাইবার জন্য এইরূপ কঠোরবাণী প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বহু কথা তিনি বলিয়াছিলেন। সামান্য ভাবে লিখিত হইল।

ব্যক্তিগত ঈশ্বর মহা ভ্রান্তি মত (Personal god is a big superstition)—অদ্বৈত বাদের লেকচারের শেষ অবস্থায় স্বামিজী

একদিন বলিয়াছিলেন, "Personal god is a big superstition।" অর্থাৎ শূন্যেতে একজন ব্যক্তি আছেন তাহার বাসস্থানের নাম স্বর্গ, এবং তথায় তিনি এক রাজ প্রাসাদে অবস্থান করেন, নিজের ইচ্ছামত সৃষ্টি করেন ও সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করেন—ইহা মহা ভুল ধারণা।

* [স্বামিজী এই বিষয়ে বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং নানা তর্ক যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছিলেন। কারণ personal god—ব্যক্তিগত ঈশ্বর অদ্বৈতবাদে হয় না। এই প্রশ্নটি আধুনিক নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হইতেছে। বুদ্ধ যখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন তখন আরাঢ় (Arada) এবং রুদ্রক রামপুত্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আরাঢ়ের সহিত তর্ক হওয়াতে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, (objected to the theory of creation by Iswara), "একজন ঈশ্বর যে সৃষ্টি করিতেছেন ইহা সত্য নয়।" কারণ বুদ্ধের মত ছিল যে দ্বাদশনিদান বা আদি কারণ হইতে সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে। কোনও এক ব্যক্তির ইচ্ছাধীন হইয়া জগত সৃষ্ট হইবার নহে। এইজন্য বোধিসত্ত্ব ব্যক্তিগত ঈশ্বর বিষয়ে অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহারা ভক্তিমার্গের পথিক, তাহারা একজন স্রষ্টা বা আদি কারণ নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু অপর দার্শনিক মতে স্রষ্টা বা সৃষ্টি এক হইয়া যায়। সৃষ্টি বা স্রষ্টা দুইটি সংজ্ঞা করিতে হইলে মধ্যে এক ব্যবধান বা বিচ্ছেদ আসে কিন্তু এই ব্যবধান বা বিচ্ছেদ থাকিতে পারে না। স্বামিজী পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "Nature abhors vacuum।" তিনি তাঁহার লেকচার কালে বহুস্থানে বলিয়াছিলেন—স্রষ্টার ভাব হইতেছে গুণসমষ্টি। কিন্তু গুণ নিত্য নয়, গতিশীল ও সময় সাপেক্ষ। এইজন্য গুণ সকল তিরোহিত হইলে ঈশ্বরও নাশ হইবে, কেবল মাত্র এক অব্যক্ত যাহা ভাষা ও চিন্তার অতীত, তাহাই বর্তমান থাকে, বৌদ্ধগ্রন্থে ইহাকেই 'অনুত্তর সম্যক্ সম্বোদ্ধ্যম্' বলা হয়, ও অদ্বৈতগ্রন্থে এই জ্ঞানটি

'পূর্ণ পরাজ্ঞান' রূপে প্রচলিত (complete and final knowledge)। এই স্থলে ইহা বিশেষ ভাবে আর ব্যাখ্যা করা হইল না। ইহার ব্যাখ্যাকালে স্বামিজীকে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় দেখাইতেছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর, মুখভঙ্গি ও নেত্রের দৃষ্টি অতিশয় প্রদীপ্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। যাহাকে বলে—'দুস্প্রেক্ষ্য বদনস্তস্য', তর্ক, যুক্তি ও ভাষায় তিনি কি বলিলেন, তাহা কাহারও বিশেষ মনে থাকিত না, কিন্তু সকলেরই মনে হইত যে একটি জ্বলন্ত অনল রাশি সম্মুখে রহিয়াছে, সেই দেহ হইতে অনর্গল অজস্র ভাবরাশি ও বাণী নির্গত হইতেছে। তাঁহার ভাবটি স্বল্পরূপে এস্থলে প্রদত্ত হইল] *

আচ্ছন্ন করা (Hypnotise)—স্বামিজীর লেকচারের এক বিশেষ অঙ্গ ছিল hypnotise বা আচ্ছন্ন করা বিষয়ে বলা। তিনি বলিতেন, "স্বীয় অদ্ভূত অন্তর্নিহিত শক্তি থাকা সত্বেও মানুষ সর্বদা আত্মশক্তি বিস্মৃত হইয়া আচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। আত্মহারা হইয়া সর্বদা নিজেকে দুর্বল বোধ করিতেছে। কিন্তু আত্মশক্তির জ্ঞান হইলে বা সুষুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইলে এই বিমোহিত ভাব দূর হয় ও মানুষ নিজশক্তি সিংহ বিক্রমে বিকাশ করে।" এই বিষয়টি তিনি বহুভাবে বলিয়াছিলেন—নিম্নলিখিত সিংহ শাবকের উপাখ্যান দ্বারা যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে প্রদত্ত হইল।

ঘটনা ক্রমে একটি সিংহ শাবক একদল মেষের সহিত বাস করিত। মেষের ন্যায় সগোষ্ঠীর সহিত তৃণাহার করিয়া ও মেষের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভীরুতা প্রকাশ করিত। সিংহ শাবক যথা সময়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বৃহৎ সিংহ হইল, গ্রীবা দেশে কেশর নির্গত হইল, আয়তনে বৃহদাকার বলিষ্ঠ সিংহ হইয়াও মেষগণের সহিত অবস্থান করায় অতিশয় ভীরু ও তৃণভোজী থাকিল। সামান্য বিবাদ

* টীকা—গ্রন্থকার।

হইলেই সেই যুবা সিংহটি মেষগণের সহিত দ্রুতবেগে পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করিত। একদিন অপর একটি বৃহৎ সিংহ সেই মেষদলকে আক্রমণ করিল। প্রাণভয়ে মেষগণ পলায়ন করিল—সঙ্গে চলিল সেই যুবা সিংহটি। আক্রমণকারী সিংহ এই ঘটনায় আশ্চর্য হইল, এবং কৌশলক্রমে মেষ-সিংহটিকে আটক করিল। তখন সে ভয়ে মেষের ন্যায় রব করিতে লাগিল। অতঃপর সে তাহাকে এক নদীতটে লইয়া যাইয়া স্বচ্ছজলে উভয়ের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল। যুবাটি প্রথমে মেষের ন্যায় রব করিতে লাগিল, কিন্তু পরে সে সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে সক্ষম হয়। নিজেকে সিংহজ্ঞান করিল ও জানিতে পারিল যে, মেষ হয় সিংহের খাদ্য।

স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, "প্রত্যেকের ভিতর যে আত্মন আছে, উহা সর্বশক্তিমান। কিন্তু মানুষ উহা বিস্মৃত হইয়া আত্মহারা হইয়া আছে এইজন্য সর্বদা নিজেকে শক্তিহীন জ্ঞান করে; কিন্তু যদি সে স্বীয় আত্মার উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার দুর্বলতা দূর হইয়া সে স্বয়ং আত্মন হইয়া যায়।" লেকচারটি নানা-ভাবে বহুক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া স্বামিজী সকলের মনে একটা সাহস দিয়া সকলকে বিশেষভাবে প্রফুল্ল করিয়াছিলেন।

* [এই ভাবটি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মন যখন নিম্ন-ভাবে থাকে, তখন শক্তিকে দুইভাবে দেখে। একটা বাহ্যিক ও অপরটা আভ্যন্তরিক শক্তি। বাহ্যিক শক্তি অর্থাৎ সমস্ত জগৎ হইতে অতীব মহতী শক্তি আসিয়া আভ্যন্তরিক শক্তিকে বিচূর্ণ করিয়া আত্মপ্রতাপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই হইল সাধারণ অবস্থা। ইহাকে দ্বন্দ্ব অবস্থা বলে (Contentious aspect of nature)। Zoroastrian বা পারসিক ধর্মমতে Jurdust এই দুইটি সতত দ্বন্দ্বায়মান শক্তিকে আভ্যন্তরিক শক্তি বলিয়াছে এবং একটিকে সুদেব ও অপরটিকে কুদেব নামে অভিহিত করিয়াছে।

Sapandamanu—সুদেব, Angarmanu—কুদেব, মজদাআহুরা এবং অরিমান। সুদেব ও অরিমান পরস্পর শত্রু। উভয়েই নিয়ত দ্বন্দ্ব করিতেছে। ইহাদিগের মীমাংসা কখনই হইবে না।

ইহুদী ধর্মে ইহাকেই Good God ও Bad God বলা হয়—Jehovah ও Satan। একদিকে যেমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শক্তি, অপরদিকে সেই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শক্তি অন্তর্নিহিত শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নিরন্তর দ্বন্দ্ব করিতেছে এবং এইরূপ দ্বন্দ্ব দ্বারা মনুষ্য নিয়ত অভিভূত হইয়া থাকে। Zoroastrian ও ইহুদীদিগের সুদেব ও কুদেবের প্রশ্ন এইস্থলে আসে না; কিন্তু কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা ভাল, তজ্জন্য বলা হইল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই দ্বন্দ্ব অবস্থা হইতে কিরূপে নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় বা আত্মনে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কারণ বক্তৃতা-কালে স্বামিজী দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় অবস্থানপূর্বক পূর্ণমাত্রায় অদ্বৈত-ভাবের কথা বলিয়াছিলেন। ইহা সাধারণের বোধগম্য নহে। এইজন্য দ্বন্দ্ব অবস্থা হইতে নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় যাইবার ভিন্ন ভিন্ন যে সকল মত আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যাহারা ভক্তিমার্গের লোক, তাহারা সর্বদা মৃদুস্বভাববিশিষ্ট। বাহ্যিক শক্তিকে অতিশয় মহতী জানিয়া, তাহারা ত্রস্ত ও বিহ্বল হইয়া আত্মশক্তিকে খর্ব করিয়া থাকে। এই বাহ্যিকশক্তির নিকট অবনতমস্তক হইয়া তাহারা বিনীতভাব ধারণ করে এবং ঐ বাহ্যিক শক্তি হইতে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া জীবনযাপন করিয়া থাকে। অপর ভাষায় ইহাকেই কৃপা বা Grace বলে। তাহাদিগের মত যে, নিজের শক্তিতে কিছুই করিতে পারা যায় না, অন্য কোন শক্তির দ্বারা তাহারা চালিত হইতেছে; ইহারাই ভক্তিমার্গের লোক।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মত যে, বাহ্যিক শক্তি বা আভ্যন্তরিক শক্তি উভয়েই শক্তি বটে, কিন্তু মধ্যদেশে একটা ব্যবধান আছে। এই ব্যবধানটি সংযুক্ত করিতে পারিলেই উভয় শক্তি সম্মিলিত হইবে।

ইহারা বলে যে, প্রথম সোপান হইতেছে, সমজাতীয়, দ্বিতীয় সোপান, সমগুণান্বিত এবং তৃতীয় হইল সমপ্রাণ। অর্থাৎ, নিম্ন অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া একীভূত হওয়া যায়। ইহা হইল ভক্তি ও জ্ঞান মিশ্রিত ভাবের পরিচয়। অর্থাৎ আভ্যন্তরিক শক্তিকে প্রথম অবস্থায় গতিরোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে বাহ্যিক শক্তির সহিত সংমিশ্রিত করা।

কিন্তু অপর একটি পন্থা আছে—যাহা পূর্ণমাত্রায় অদ্বৈতবাদীর মত। এই মতে প্রথম ধারণা করিয়া লইতেছে যে, অহং বা আত্মন্ সর্বশক্তিমান এবং এই অহং হইতেই বাহ্যিক জগত বা সৃষ্টি প্রতিভাত হইতেছে। জগত হইতেছে এই আত্মনের অধ্যাস মাত্র। এই অধ্যাস বা প্রতিবিম্ব বশতঃ আমরা জগত দেখি। এতদ্ব্যতীত জগতের নিজের বা স্বাতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যাহাকে বাহ্যিকশক্তি বলা হয়, তাহা অহং বা আত্মনের অধ্যাস মাত্র। এইজন্য অপরের নিকট পূজা বা প্রার্থনা করিবার আবশ্যক নাই। কৃপা অর্থে একের প্রাধান্য ও অপরের অপ্রাধান্য বুঝায়—ইহাতে দুইটি সংজ্ঞা হয়। অদ্বৈতভাবে দুইটি সংজ্ঞা গৃহীত হয় না। এক বা আত্মন্ সর্বত্র বিরাজ করিতেছে এবং নিজ অধ্যাস বশতঃ নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিকরূপ, আয়তন বা অবয়ব সমস্তই আত্মন্ নিজ মায়ায় সৃজন করিতেছে ও নিজ মায়ায় বিলোপ করিতেছে।

লেকচারকালে স্বামিজী পূর্ণমাত্রায় অদ্বৈতবাদী হইয়া বাহ্যিকশক্তি অস্বীকার করিয়া আত্মন বা আভ্যন্তরিক শক্তির কথা বলিতেছিলেন। এই আত্মন বা আভ্যন্তরিক শক্তি প্রথম অবস্থায় সুষুপ্ত থাকে, কিন্তু প্রবুদ্ধ হইলে সর্বপরিব্যাপ্ত হয়। তখন দ্বিধা, সঙ্কোচ প্রভৃতি কিছুই থাকে না, ভিতর হইতে মহা এক তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমস্ত বাহ্যিক জগত আলোড়িত করিয়া থাকে। কিন্তু যতদিন এই সুষুপ্ত শক্তি প্রবুদ্ধ না হয়, ততদিন মানুষ আত্মহারা বা বিমোহিত

হইয়া থাকে। এই অবস্থাকেই স্বামিজী hipnotised stage বা আচ্ছন্নভাব বলিয়াছেন।

উপরকার ঘরে রাজযোগের লেকচার বহুদিন চলিয়াছিল। নানা বিষয়ে নানা আলোচনা হইয়াছিল। সংক্ষেপে কিয়দংশমাত্র এইস্থলে প্রদত্ত হইল। অপর অনেক বিষয় বলিলে গ্রন্থকলেবর দীর্ঘ হইবে ও পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হইতে পারে—এই আশঙ্কায় বহু বিষয় সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

স্বামিজীর 'রাজযোগের' লেকচার জগতে বিরল। কি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, কি ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান। দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান এবং বহুবিধ বিষয়ে নানা উল্লেখ ও উদাহরণ দ্বারা তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইতেন। 'রাজযোগের' এক একটি সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি কয়েকদিন লেকচার করিতেন ও বহুপ্রকার ধ্যান ও মনের গুহ্যতম গতি সেইসঙ্গে করাইয়া লইতেন। তাঁহার লেকচারকালে এই বিশেষত্ব দেখা যাইত যে, তিনি তাঁহার মনের সাহত শ্রোতার মন মিশ্রিত করিয়া উচ্চাবস্থায় লইয়া যাইতেন। অজ্ঞানতঃ লোক যে গভীর ধ্যান করিতেছে—ইহা কেহ বুঝিতে পারিত না। এইজন্য তাঁহার ব্যবহৃত ভাষা ও তর্ক-যুক্তির প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকিত না। এইস্থলে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমে শব্দ উচ্চারণে বা ধ্বনিতে, দ্বিতীয়তঃ ভাবে, তৃতীয়তঃ ভাবের অভ্যন্তরে শক্তি বা জীবন্ত মূর্তি বা বিগ্রহ অন্তর্নিহিত থাকে। স্বামিজী প্রথমে শব্দ বা ধ্বনি নির্গত করিতেন। শ্রোতার মনে উহা প্রথম অবস্থায় ভাবরূপে পরিণত হইত। পরে উহার মধ্যে যে শক্তি বা চিত্র বা বিগ্রহ আছে, তাহা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া ভাবরাশি জীবন্ত মূর্তিমানরূপে দর্শন করিত। ইহাকেই বলে ভাবদর্শন বা জ্ঞানদর্শন। বক্তা অতি উচ্চ অবস্থায় সমারূঢ় না হইলে স্বীয় নির্গতশক্তি অপরকে দর্শন করাইতে পারে না। এই সময় তিনি সম্পূর্ণরূপে বিদেহ হইতেন—তাঁহার তখন দেহজ্ঞান আদৌ থাকিত না। ইহাকেই যোগশক্তি বলা হয়।

চিদাকাশে ভাবসমূহ সুষুপ্ত ও অপরিস্ফুট অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, পরে উহাদিগকে চিদাভাসে আনয়ন করিতে হয়। পক্ষান্তরে ইহাকে চিদাকাশ হইতে চিত্তাকাশে আনয়ন করা বলে (from conscious plane to mental plane)। অতীব শক্তিমান বা উচ্চাবস্থার লোক না হইলে এইরূপ কেহ ভাবদর্শন করাইতে পারে না। অনেককাল ধ্যান-জপ করিলে ও শক্তি সঞ্চয় করিলে কখনও কখনও সাধকের ভাবদর্শন হয়· অর্থাৎ ভাব জীবন্ত, তাহার ভিতর রূপ, বর্ণ ইত্যাদি আছে। কিন্তু স্বামিজী এইরূপ শক্তিমান পুরুষ ছিলেন যে, লেকচারকালে বিনা আয়াসে, বিনা অনুধ্যানে শ্রোতৃবৃন্দের মনগুলিকে অতি সহজেই এই উচ্চাবস্থায় উত্তোলন করিতে পারিতেন। চলতি কথায় বলে, এক এক দেবতার এক একটি ধ্যানমূর্তি আছে। সেই ধ্যানমন্ত্র জপ করিলে সেই দেবতার মূর্তি দর্শন করা যায়, যথা—দুর্গা, কালী, শিব ইত্যাদি—সেই ধ্যানের মন্ত্র বিশেষ। এই ধ্যানমূর্তি দর্শন করিয়া পূজাদি করিতে হয়। ইহা কষ্টসাপেক্ষ। বহু বৎসর সাধনা করিলে এই অবস্থা লাভ হয়। কিন্তু স্বামিজীর লেকচারে ইহা ছিল একটা নিত্য অঙ্গবিশেষ। অর্থাৎ নিজের ভিতর তিনি যখন যে ভাবটি দর্শন করিতেছিলেন, অধ্যাস শক্তিদ্বারা শ্রোতার ভিতর তিনি উহা প্রবেশ করাইয়া দিতেন এবং তাহারাও উহাকে তখন স্পষ্ট সম্মুখে দেখিত। গৃহ, পার্শ্বস্থিত ব্যক্তি, শব্দ, তর্কযুক্তি ইত্যাদি কিছুই কাহারও স্মরণ থাকিত না। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ মূর্তিসমূহ ভাবরাশি হইতে বিকীরিত হইয়া সম্মুখে নির্বাক ও নিস্পন্দরূপে দণ্ডায়মান থাকিত।

Philosophyকে সংস্কৃত ভাষায় 'দর্শন' বলা হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাবগুলিকে জীবন্ত মূর্তিমানরূপে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই কেবল দর্শনশাস্ত্র লিখিতে উপযুক্ত। অপর ব্যক্তি তদ্রূপ নহে। স্বামিজী এইজন্য সর্বদাই বলিতেন, 'visualise the ideas'। ভাবসমূহ দর্শন করা যায় এবং উহা উপলব্ধি করিতে তিনি বহুবার

অনুরোধ করিতেন। অর্থাৎ এই 'visualising the ideas' না হইলে কাহারও নিশ্চয়াত্তিক জ্ঞান হয় না। এইজন্য পূর্ণ জ্ঞান, বিবর্তবাদ, অব্যক্ত, অবস্তু, পরাজ্ঞানবাদ, ঈশ্বরজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে জটিল প্রশ্ন তুলিয়া তিনি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে সেই সমুদয় নানা জটিল ভাবের সামান্য ইঙ্গিতমাত্র করা হইল।

'রাজযোগে' বহুপ্রকার সমাধির বিষয় বর্ণিত আছে। এক এক প্রকার সমাধি হইলে স্নায়ুর বাহ্যিক ক্রিয়া শ্লথ হইয়া যায় এবং উহার আভ্যন্তরিক ক্রিয়া হয় এবং সূক্ষ্মস্নায়ু সকল সুষুপ্ত অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা লাভ করে ও তথায় অবস্থান করিলে ভাব-সমূহ প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্য হয়। স্বামিজী লেকচারকালে উচ্চাঙ্গের সমাধির কথা বলিতেন। ঐ সময়ে তাঁহার মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর প্রভৃতির তদনুযায়িক পরিবর্তন ঘটিত এবং পূর্বদেহে নব নব ভাবানুযায়িক নব নব দেহের বিকাশ পরিলক্ষিত হইত অর্থাৎ একই ব্যক্তি একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া একই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া চৌদ্দ পনর রূপে উচ্চাঙ্গের ব্যক্তি হইতে পারিতেন। এই সময় তাঁহার বদন দুষ্প্রেক্ষ হইত, তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করা অতীব কষ্টকর হইত অথচ আনন্দপূর্ণ স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বর। ভাবসমূহ পুঞ্জীভূত হইয়া যেন পরিলক্ষিত হইতেছে। তখন তাঁহার মুখভঙ্গি, চক্ষের স্থির গম্ভীর অনিমেষ দৃষ্টি, চক্ষুতারার বিন্দু ঊর্দ্ধগতি এবং দেহ হইতে কিরূপ একটা জ্যোতি নির্গত হইত, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ, আস্থাপ্রদ ও তরঙ্গায়মান ; সঙ্কোচ, সন্দেহ, দ্বিধাতীত ভাব প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান হইত। প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভগবান বুদ্ধের উপদেশকালে নাদ বা বাণী তাহার কণ্ঠ হইতে এইরূপ ভাবে নির্গত হইত যাহাতে কাহারও দ্বিধা, সঙ্কোচ ও সন্দেহ থাকিত না। ইহাকেই 'নাদব্রহ্ম' বলা হয়। অর্থাৎ দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় উপনীত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মশক্তি কণ্ঠনালী

দ্বারা বিকশিত হয়। কেবলমাত্র নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় উপনীত হইলে কণ্ঠ হইতে এই বাণী বা নাদ বিনিস্থৃত হইতে পারে। কিন্তু দ্বন্দ্বাধীন অবস্থায় অর্থাৎ সংশয় সন্দেহ অবস্থায় থাকিলে, কণ্ঠ হইতে এই নাদ বা বাণী বিনিস্থৃত হইতে পারে না। কণ্ঠনালী দ্বারা ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান, নাদ বা বাণী কিরূপ উচ্চ, উচ্চতর বা উচ্চতম হইতে পারে, স্বামিজী তাহা বিশেষ ভাবে সকলকে দেখাইয়াছিলেন। সাধারণ পাঠক তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এই বিষয় সকল 'রাজযোগের' বহু প্রকার সমাধির পরিচায়ক বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন। নিজে সাধক না হইলে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এই স্থলে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, স্বামিজী যেন বুদ্ধদেবেরই প্রতিবিম্ব স্বরূপ—মাত্র ২৫০০ বৎসরের ব্যবধান। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ভগবান বুদ্ধের রূপ, অঙ্গ সঞ্চালন, কণ্ঠস্বর প্রভৃতির বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে স্বামিজীর অবস্থার বিষয় (রাজযোগে বক্তৃতাকালে) অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে, বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না, মাত্র দেশ, কাল, নিমিত্ত অনুযায়ী বক্তব্য বিষয় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। ইহা নিমিত্ত কারণ বা ভাবব্যাপক মাত্র, কিন্তু আভ্যন্তরিক বা মনোভাবের উর্দ্ধগতি একই প্রকার ছিল, যেন একটি অপরের প্রতিবিম্বরূপে প্রতিফলিত হইত। এই গ্রন্থের বহুস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, লেকচারকালে স্বামিজী সম্পূর্ণরূপে বিদেহ হইয়া যাইতেন—(incorporeal form) অর্থাৎ তিনি মনুষ্য দেহের আবরণের ভিতর থাকিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেন, এবং অহং বা আত্মন নিরপেক্ষভাবে পরিলক্ষিত ও পরিদর্শিত হইতে পারে না, সেইজন্য সূক্ষ্ম বা কারণ শরীর অবলম্বন পূর্বক স্বামিজী স্থূল শরীরে অবস্থান করিতেন, অর্থাৎ স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া তিনি সূক্ষ্ম, কারণ বা মহাকারণ শরীর অবলম্বন করিয়া অহং বা অহংজ্ঞান নেত্রের দৃষ্টি, মুখভাব, কণ্ঠস্বর বা বাণী

দিয়া বিকাশ করিতেন। ইহা এক অভিনব স্বতন্ত্র বস্তু। সাধারণ বা বাহ্য বস্তুর সহিত ইহার কোনও রূপ সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ চেতন সমাধির—নানা উচ্চাঙ্গে অবস্থান পূর্বক তিনি অন্তর হইতে বাহিরে শক্তি বিকাশ করিতেন। স্থূল দেহ দ্বারা এই সকল বুঝা যায় না। বিদেহ হইয়া তিনি নানাভাব বিকাশ করিতেন এবং ভাবসমূহ তাঁহার সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে অবস্থান করিত এবং তিনি উহা অপরকে দেখাইতেন। ভাবসকলের যে জীবন্তরূপ আছে ও হস্তদ্বারা স্পর্শ করা যায়—স্বামিজী তাহা সকলকে প্রত্যক্ষ করাইতেন। এইজন্য স্বামিজী প্রদত্ত 'রাজযোগের' লেকচার জগতের ইতিহাসে চিরকাল উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। ইহাকে বলে প্রত্যক্ষ দর্শন—শুধু বাক্য-বিন্যাস নহে।

'রাজযোগের' নানাপ্রকার স্থূল অঙ্গের ও বহু প্রকার সমাধির বিষয় কয়েকদিন লেকচার দিয়া উহা সমাপ্ত করিতে স্বামিজী মনস্থ করিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে লেকচারের বিষয়টি শেষ হইলে, তিনি ক্ষণিক স্থির—নির্বাকভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি রূপান্তরিত হইলেন। পূর্ব ব্যক্তি, পূর্ব ভাব ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, নেত্রের দৃষ্টি ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন হইল এবং তৎপরিবর্তে একটি অভিনব স্বতন্ত্র ব্যক্তি এখন তাঁহার ভিতর হইতে পরিস্ফুট হইল। এইবার তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন—সহসা তাঁহার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল :—

"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥"

ইংরাজিতে বলা যায়—Blissful is the air, blissful is the water, etc.

পূর্বোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি উচ্চারণ ও আবৃত্তি করিতে স্বামিজীর প্রায় আট দশ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। এক একটি চরণ উচ্চারণ করিতেছিলেন, আর কি যেন স্থিরনেত্রে লক্ষ্য করিতেছিলেন ও নির্বাকভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। পুনরায় আর একটি পংক্তির উচ্চারণ ও পূর্ববৎ নিস্পন্দ ও নির্বাকভাবে অবস্থান। এইরূপে সমুদয় শ্লোকটি শেষ হইল। সংস্কৃত ভাষায় উহা বলা হয়, কেহই উহার অর্থ বা উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল না, কিন্তু নাদব্রহ্ম এরূপ প্রত্যক্ষ বা শক্তিমান বস্তু যে স্বামিজী যখন ঐ শ্লোকটি প্রথমে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন তখনই ঐ গৃহমধ্যে গালিচার উপর চেয়ারে উপবিষ্ট বিশিষ্ট শ্রোতাগণ (প্রায় ১৫০।২০০ শত সংখ্যা) নিঃশব্দে চকিতে স্বীয় চেয়ার সরাইয়া গালিচার উপর নতজানু হইল, এবং করজোড়ে ও নতমস্তকে অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাত্র চেয়ার সরাইবার শব্দ প্রথমে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর গৃহটি সম্পূর্ণভাবে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল। শুধু দেওয়ালগাত্রে গ্যাসের আলোটার সোঁ সোঁ শব্দ হইতেছিল। উক্ত শ্লোক উচ্চারণকালে প্রত্যেক শব্দ, মাত্রা, যতি, ছন্দ ইত্যাদি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, এবং কণ্ঠ বিনিসৃত সাম্য-স্পন্দনটি (rhythmical vibration) কিরূপ তাহা তিনি সকলকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দকে মুহূর্তে স্থানচ্যুত করাইয়া ও ক্ষণিকের মধ্যে তাহাদিগের মনোবৃত্তি সমূহ অনুরূপে পরিবর্তন করাইয়া স্বামিজী নাদব্রহ্মের অদ্ভুত শক্তি ও মাধুর্য প্রমাণ করিলেন। সংস্কৃতে শ্লোকটি বলিবার পর তিনি ইংরাজীতে উহা ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আশীর্বচনটি শেষ হইলে পূর্বের মত এই রাত্রে স্বামিজীর সহিত বাক্যালাপ করিতে কাহারও সাহস হইল না। তাঁহাকে তখন বোধ

হইতেছিল যেন তিনি স্বতন্ত্র জগতের লোক,* স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। আশীর্বাদ শেষ করিয়া তিনি গম্ভীরভাবে গৃহত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে অতি সসম্ভ্রমে সকলে চলিল।

নাদব্রহ্ম কি ও স্বামিজীর কণ্ঠস্বর হইতে কিরূপে ইহা নির্গত হইয়াছিল তাহা জানিতে অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে, এইজন্য এইস্থলে ইহার বিষয় কিঞ্চিৎ প্রদত্ত হইল। ধ্যান, জপ যখন অতি গভীর অবস্থায় চলিয়া যায়, অর্থাৎ সবিকল্প সমাধিতে মন উপনীত হয়, এবং দেহ ও আবরণীর সহিত যখন বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকে না, কেবলমাত্র চিন্ময় সত্তা হইয়া থাকে, সেই সময় উদ্ভুত শক্তি যদি কণ্ঠনালী দিয়া প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে সবিকল্প সমাধি শব্দ ও স্পন্দনরূপে বিনিস্থত হয়। ইহা সঙ্গীত বা অন্যপ্রকার রাগরাগিণীর ব্যাপার নহে। ইহা স্বতন্ত্র বস্তু এবং সবিকল্প সমাধি যে কি ব্যাপার তাহার পরিচায়ক মাত্র। ইহাকে ইংরাজিতে rhythmic vibration বলা হয়। স্বামিজী এই শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন।

লেখকের স্বামিজীর জীবনে আর একবার ওই নাদব্রহ্মের দর্শন লাভ হইয়াছিল। কাশীপুর বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পীড়া যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন লেখক, কালী মহারাজ (শ্রীঅভেদানন্দ) ও অপর এক ব্যক্তির সহিত স্বামিজী গাড়ী করিয়া কাশীপুর হইতে কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছিলেন। ঐ সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না—সম্পূর্ণরূপে বিভোর, চক্ষের দৃষ্টি অন্যপ্রকার ও মস্তকটি অতি কষ্টে স্থিরভাবে যথাস্থানে রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কাশীপুরের উভয় পার্শ্বে তখন কেবল বন-জঙ্গল ও বাগান ছিল, বসত বাড়ী বিশেষ ছিল না। ফাল্গুন মাস—সকাল বেলা, বেশ হাওয়া বহিতেছিল। গাড়ীতে বসিয়া তিনি যেন কি একটি লক্ষ্য করিয়া তন্ময় হইতেছিলেন। সেই সময় তিনি অতি ভাবের সহিত শঙ্করাচার্যের স্তবটি "পিতা নৈব মাতা···শিবোহং শিবোহং"

উচ্চারণ করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি হইতে তখন স্পষ্ট বোঝা যাইল যে, ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্ম উপলব্ধি কি বস্তু। ইহাকেই 'নাদব্রহ্ম' বলে। কখনও সমাধি অবস্থায়, কখনও সমাধিতে যাইবার সময়, কখনও বা সমাধিভঙ্গে পুনরায় দেহে প্রত্যাবর্তন কালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণেরও একপ্রকার কণ্ঠস্বর নিঃসৃত হইতে দেখা যাইত, তাহাও এই একই বস্তু। বুদ্ধের জীবনীতে লেখা আছে যে, উপদেশকালে তাঁহার এমন কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইত যাহাতে পরম শত্রু ও বিরোধী ব্যক্তিও বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার সহিত তর্কযুক্তি, সঙ্গীতচর্চা ইত্যাদি পার্থিব বস্তুর কোনও সম্পর্ক নাই। ইহা কেবল সবিকল্প সমাধি অবস্থায় উদ্ভূত হয়, অন্য অবস্থায় কখনও হইতে পারে না।] *

* টীকা—গ্রন্থকার।

ওয়াটার পেণ্টিং গ্যালারিতে লেকচার

Water Painting Galleryতে রবিবারে স্বামিজী যে সকল বক্তৃতা দিতেন, তাহা সমস্তই প্রায় পুস্তক আকারে রহিয়াছে। 'জ্ঞানযোগ' বা 'ভক্তিযোগ' নামে যে সকল বিভিন্ন গ্রন্থ আছে, সকলই প্রায় এই স্থানে প্রদত্ত হইয়াছিল। এইজন্য এই স্থলে ইহার পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। স্বামিজী কিন্তু সর্বদাই এই কথাটি বলিতেন, "If I meditate on the brains of a Buddha, I become Buddha; if I meditate on the brains of a Sankara, I become Sankara (অর্থাৎ বুদ্ধকে অভিষ্ট করিয়া ধ্যান করিলে আমি বুদ্ধ হইয়া যাই, আর শঙ্করকে অভিষ্ট করিয়া ধ্যান করিলে আমি শঙ্কর হইয়া যাই)। আমার সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকে, আমি তাহাকে দেখি ও কথা বলি। আমার নিজের বলিবার কিছুই থাকে না।" এইরূপ সামান্য দুটি একটি কথায় বেশ বুঝা যায় যে, স্বামিজী কত উচ্চ অবস্থায় উঠিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে বলিতেন, 'visualising the ideas', ভাবসমূহ যে স্পষ্ট দেখা যায়, বক্তৃতাকালে তাহা স্বয়ং উপলব্ধি করিতেন। এইরূপে নানা উচ্চাঙ্গের কথা তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেন, কিন্তু স্মরণ না থাকায় সবিশেষ প্রদত্ত হইল ন

লেকচার সমাপ্ত হইলে স্বামিজী শ্রোতাগণের সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেন, কখনও বা Sturdyর সহিত অন্যত্র গমন করিতেন।

পূর্বে নানা স্থলে রবিবারে Water Painting Galleryতে লেকচারের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু একত্রে বলা বিধেয় মনে করায় উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এইস্থলে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

প্রত্যেক শুক্রবারে বা শনিবারে Goodwin, সারদানন্দ স্বামী

ও বর্তমান লেখক সকলে মিলিত হইয়া বক্তৃতার বিষয় ছোট পুরজা লিখিয়া রবিবারে সমস্ত কাগজে পাঠান হইত, কিন্তু পাদ্‌রী প্রাধান্য দেশে বিদেশী ধর্ম উপদেষ্টার কথা আপনাদিগের ধর্ম-বিরোধী মত বিবেচনা করায় ঐ বিজ্ঞপ্তি সকল গীর্জা-সংবাদ বা ধর্ম উপদেশ স্তম্ভে কখনই প্রকাশিত হইত না। Goodwin একগুঁয়ে লোক— সেও পুরজা পাঠাইতে কখনই বিরত হইত না।

রবিবার অপরাহ্ণে ঘোড়াটানা বাসগাড়ীতে বসিয়া সকলে Piccadilyতে যাওয়া হইত। স্বামিজী ও Sturdy বাসের ছাতের উপর বসিতেন, Goodwin, সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক পশ্চাতে থাকিতেন। স্বামিজী সিগারেট মুখে Sturdyর সহিত নানা গল্প, হাস্যকৌতুক করিতে করিতে যাইতেন। লেকচার দিতে হইবে এই বিষয়ে তাঁহার কোনও চিন্তা বা উদ্বেগ থাকিত না। ঠিক যেন বৈকালে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। যথা সময়ে গাড়ী Piccadilyতে আসিলে সকলে লেকচারস্থলে গমন করিত। পূর্ব-পরিচিত বহু নরনারীর সহিত স্বামিজী নানাপ্রকার কথা কহিতে লাগিলেন। সাদাসিদা, সরল হাস্যকৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি যেমন কোন পূর্বপরিচিত বন্ধুকে দেখিয়া আপ্যায়িত করে, ঠিক যেন তিনি তাহাদিগের মত লেকচার শুনিতে আসিয়াছেন—তিনি যে বক্তা, তার কোন চিহ্নই মুখে প্রকাশ পাইত না, কোনও প্রকার উদ্বেগ বা চাঞ্চল্যভাব দৃষ্ট হইত না। নির্বাচিত সময়ের কিছু পূর্বে Goodwin লেকচারের বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দিত। তিনি উপস্থিত-বক্তা ছিলেন, পূর্বে কিছুই চিন্তা করিতেন না। এইজন্য আমেরিকায় তাঁহাকে বলিত—He is an orator by divine right—অর্থাৎ দৈবশক্তিবশতঃ তিনি বাগ্মী, নরশক্তিতে তিনি কিছুই বলেন না—কথাটি অতি সত্য।

নির্ধারিত সময়ে স্বামিজী ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণ হল ঘরটিতে প্রবেশ করিতেন। উহার অপর প্রান্তে ছিল একটি কাঠের মঞ্চের উপরে

একটি টেবিল ও নিকটে জলপাত্র, চেয়ার থাকিত না। Goodwin লেকচারের পূর্বে সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখককে মঞ্চের নিকট স্থান করিয়া দিত। হাস্যকৌতুকবিশিষ্ট স্বামিজী দরজার ভিতর প্রবেশ করিলেন। সকলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। মধ্যবর্তী অল্পপরিসর স্থান অতিক্রম করিয়া মঞ্চের উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। হস্তদ্বয় বক্ষস্থলে স্থাপনপূর্বক দুএক মিনিট স্থিরনেত্রে স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিয়া মঞ্চের উপর সিংহের ন্যায় ক্ষণিক পদচারণ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান পূর্বক প্রথমে মধুর ও মিষ্টকণ্ঠে লেকচার আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দেখা যাইত যে, পূর্বের কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিটি যেন ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে ও তৎপরিবর্তে যেন এক মহা তেজস্বী শক্তিমান ওজসপূর্ণ ব্যক্তি অন্তর হইতে বিকাশ হইয়া সমস্ত দেহকে আচ্ছন্ন করিতেছে। পূর্বব্যক্তির স্থলে এক মহাশক্তিমান, আজ্ঞাপ্রদ, ভয়মাধুর্যপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল বিকশিত হইত। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও স্থিরদৃষ্টি, সতন্ত্র ব্যক্তি, সতন্ত্র কণ্ঠস্বর—নরদেহ হইতে দেবদেহ আবির্ভূত হইত। লেকচারের প্রথম অবস্থায় স্বামিজী বাহু সঞ্চালন করিয়া ও তর্জনী নির্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে স্বরের মাত্রা বর্ধিত হইত। শব্দধ্বনি ও কণ্ঠস্বর তরঙ্গায়মান, আজ্ঞাপ্রদ ও নিশ্চয়াত্মিক হইত। গৃহটির সর্বস্থান হইতে সমভাবে সকলেই সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ করিত। ভাবাবেশে প্রথমে বামহস্ত সঞ্চালিত হইত এবং পরে যেরূপ উত্তেজিত হইতেন—তাঁহার বাহুদ্বয় সেইরূপ সঞ্চালিত হইত। কখনও দেখা যাইত তিনি হস্তের অঙ্গুলি সকল সঙ্কুচিত করিতেছেন, কখনও বা বিকোচপূর্বক যেন অবজ্ঞা বা বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছেন—যেন একজন বিশেষ শিক্ষিত অভিনেতা দেহ সঞ্চালনে স্বয় মনোভাব বিকাশ করিতেছেন। স্বামিজীর এই ভাবপ্রকাশক অঙ্গসঞ্চালন একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল। ইহা অতীব মধুর ও আজ্ঞাপ্রদ। শিক্ষিত নিপুণ অভিনেতা

ভিন্ন হস্তাদি সঞ্চালনে মনোমধ্যে গভীর ভাবের ক্রিয়া ব্যক্ত করিতে সাধারণের সম্ভব নয়।

অপর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে, স্বামিজী বক্তৃতাকালে স্থিরনেত্রে উর্ধ্বদিকে কি যেন লক্ষ্য করিতেন এবং উহা দেখিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতেন। কাগজে কোন নোট লিখিয়া রাখিতেন না। একভাবে তিনি বলিতেন—সম্পূর্ণ বিভোর। সম্পূর্ণ আত্মহারা! সম্মুখে বাতাসের বা শূন্যের মধ্যে কি যেন তিনি দেখিতেন এবং কণ্ঠদ্বারা শব্দ বিন্যাস করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন। এইরূপে প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টাকাল অনবরত তিনি বক্তৃতা করিতেন। লেকচার শেষ হইবার সময়—কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া পড়িত, দৃষ্টিও যেন শূন্য হইতে ফিরিয়া আসিত, বোধ হইত যেন ঐ হাওয়ার ভিতর বস্তুটিও চলিয়া গিয়াছে। শেষ হইলে জলপান করিয়া মঞ্চ হইতে নামিয়া পূর্ব সাধারণ অবস্থায় আসিতে চেষ্টা করিতেন।

অনেক সময় দেখা যাইত যে, স্বামিজী মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলে Goodwin নিকটে গমন করিত এবং তখন তিনি তাহাকে সকরুণ ও ভয়বিহ্বলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেন, "Goodwin, আমি পাগল, আমার ঠিক নেই। আমি দেখি যে আমার সামনে কি একটা হাওয়ার ভেতর দাঁড়ায়; আমি সেটাকে দেখি ও বড়্ বড়্ করে বকে যাই। মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারি না। লোকেরা ত আমায় পাগল বলে চিনতে পারে নি? কি জান, আমি ভারতীয়, আর এরা ইংরাজ—আমাদের বিজয়ী জাত। তুমি একটু সাবধান করে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো, নইলে পাগল বলে টের পেলে, এরা রাস্তায় আমায় ঢিল মারবে।" এইরূপভাবে বালকের মত সকরুণ কাতরোক্তি করিতেন। প্রদীপ্ত শক্তিমান স্বামিজীর মুখপ্রতি ক্ষণিক বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করিয়া Goodwin সাহ্লাদে বলিত, "স্বামিজী, আজ আপনি বড় সুন্দর কথা বলেছেন।" বালকের

মত তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি কথা? কি কথা?" Goodwin তখন তাহাকে সেইদিনের লেকচারে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিত। তিনি অবাক হইয়া বলিতেন, "এর মানে কি?" অর্থটি বুঝাইয়া দিলে, Goodwinকে তিনি বলিতেন, "এসব লিখে রেখে দাও। আমার বেশ লাগছে।" শিশু বা যুবক কোন উচ্চভাবের কথা শ্রবণ করিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, স্বামিজীও সেইরূপ হইতেন।

এইস্থলে ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, স্বামিজী বিদেহ বা চেতন সমাধির অবস্থায় গমন পূর্বক লেকচারকালে ঐ সকল গভীর উচ্চাঙ্গের কথা বলিতেন। সবিকল্প সমাধি অবস্থায় তিনি তাঁহার অহং বা আত্মনকে স্পষ্টভাবে সম্মুখে লক্ষ্য করিতেন এবং তদনুযায়ী তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাণী নির্গত হইত এবং চেতন সমাধিকালে ঐরূপ উচ্চভাবের কথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে বিনিসৃত হইত। এই জন্য দেহী স্বামিজী ইহার বিষয় কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিতেন না। পূর্বে অধ্যাসের বিষয় তিনি যেরূপ লেকচার করিয়াছিলেন, ইহা সেই অধ্যাসের একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ দেহের ভিতর হইতে তাঁহার সূক্ষ্ম বা কারণ শরীর আত্মনরূপে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইত এবং তিনি উহা দেখিতেন এবং তদনুযায়ী শব্দ বিন্যাস হইত। ইহাকেই বলে visualising the ideas,—ভাবসমূহ সুস্পষ্ট দেখা যায়, তাহাদের রূপ, বর্ণ ইত্যাদি আছে। ইহা অধ্যাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। স্বামিজী প্রায়ই বলিতেন, "আমি ত একটা মস্ত মুর্খ পাগল। আমার মাথায় কি কিছু আছে রে? তবে সামনে একটা জ্যান্ত ছবি দাঁড়ায়, তার হাত মুখ নড়ে, আর আমি তাই দেখে বড়্‌বড়্‌ করে বকে যাই। মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝি না। আমি যে মুখ্যু, সেই মুখ্যু।" ইহার ভাবার্থ, স্বামিজী ইচ্ছামত বিদেহ বা incorporeal হইতে পারিতেন। তিনি স্থূল বা মাংস-দেহটা পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ

কারণ বা মহাকারণ শরীর অবলম্বন পূর্বক নিজেই সম্মুখে দাঁড়াইতেন।

'রাজযোগের' লেকচারকালে এই সকল বিষয় অনেক বলিয়াছেন বলিয়া এখানে বিশদভাবে প্রদত্ত হইল না। কেবল উচ্চাঙ্গের যুগ-প্রবর্তকেরা এই উচ্চাবস্থায় আসিতে পারেন। সাধারণের পক্ষে অসম্ভব।

সারদানন্দ স্বামীর আমেরিকা গমন

সর্বদা 'রাজযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ' এবং নানা উচ্চাঙ্গের প্রসঙ্গ হইলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হইতে পারে এইজন্য অপর বিষয়ের অবতারণা করা হইল, কিন্তু উপরকার ঘরে স্বামিজীর লেকচার নিয়মিত ভাবে পূর্ববৎ চলিতে লাগিল।

আমেরিকাতে একজন কর্মীর আবশ্যক হওয়ায় স্বামিজী সারদানন্দ স্বামীকে তথায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। স্বামিজীর লেকচারে বেশ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে সারদানন্দের যাইতে ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ বহু বৎসর পর সাক্ষাৎ হওয়ায় পরম প্রীতির সহিত বাস করিতেছিলেন বলিয়া স্বামিজীর সঙ্গত্যাগ করিতে তাঁহার আদৌ মন ছিল না। অবশেষে তাঁহাকে যাইতে হইল।

Goodwinএর আর্থিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। অনেক সময় সে বাড়ীতে আহার করিত এবং মধ্যে মধ্যে সে বাহিরে হোটেলে যাইত। স্বামিজী তাহার হাত খরচাদি ও ব্যয়ভার দিতেন।

একদিন প্রাতে গৃহমধ্যে স্বামিজী, সারদানন্দ স্বামী, Goodwin ও বর্তমান লেখক বসিয়া আছেন। Sturdy ও Miss Muller অনুপস্থিত থাকায় Goodwin অবসর বুঝিয়া স্বামিজীকে তাহার মনের কথা বলিল। সে দুঃখিতভাবে বলিতে লাগিল যে Miss Muller ও Sturdy তাহাকে তেমন পছন্দ করে না ও একত্রে বসিয়া ভোজন করে না। এইজন্য তাহাকে বাহিরে খাইতে হয়, তাহার হাতে কিছুই অর্থ নাই। লণ্ডনে তাহার পরিচিত কেহ না থাকায় stenographerএর কার্যে (সংক্ষিপ্ত লিপিকার রূপে) উপার্জন করিতে পারিতেছে না। আমেরিকাতে অনেকের সহিত তাহার জানা আছে। সেখানে যাইতে পারিলে সে আপন খরচ চালাইতে পারিবে। এই কথা শুনিয়া স্বামিজী দুঃখিতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন, এখানে চেষ্টা করলে হয় না?" তদুত্তরে Goodwin বলিল, "হ্যাঁ, হতে পারে বটে, কিন্তু বাইরে দুই-তিন ঘণ্টা কাজ করতে হবে যে, তাতে আপনার চলবে কিসে? আপনার দেখা শোনা হবে কি করে?" শ্রবণান্তে স্বামিজী অতি বিষণ্ণভাবে স্থির ও গম্ভীরভাবে রহিলেন। তাঁহার তৎকালীন মুখভাব হইতে স্পষ্ট ভাব বাহির হইল যেন তিনি বলিতেছিলেন, "Goodwinটা আমার আশ্রিত, প্রাণপণে সে আমার সেবা করিতেছে, আমার সকল কথা, সকল লেকচার লিখিয়া রাখিতেছে। সে কাছে না থাকিলে আমার কোন কাজই চলে না। কিন্তু এরূপ একটা অনুগত লোককেও আশ্রয় দিতে পারা গেল না।"

Goodwin স্বামিজীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া এবং মনোভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল, "কেন স্বামিজী, আপনি এত চিন্তিত হয়েছেন? আমি না হয় বাইরে দুইতিন ঘণ্টা কাজ করে নিজের খরচ চালিয়ে নোবো। পাশের একটা বাড়ীতে একটা ঘরের বন্দোবস্ত করব। সেখানেই থাকা ও খাওয়ার ঠিক করব। আপনার লেকচার সময়ে ও অবসর মত এসে আপনার সব কাজ করে দিয়ে যাব। এখানে থাকা আর সুবিধা হচ্ছে না। আমার এখানে থাকা এদেরও (Sturdy) পছন্দ নয়। ওদের মনের ভাব যে অন্যত্র চলে যাই।" স্বামিজী বিশেষ কিছু বলিলেন না, Goodwinও বাহিরে দুই চার দিন কাটাইল।

একদিন প্রাতে স্বামিজী Goodwinকে বলিলেন, "শরৎ আমেরিকাতে যাবে, তুমিও এর সঙ্গে যাও। শরৎ নতুন লোক, আমেরিকার হাল চাল জানে না। তুমি সঙ্গে থাকলে শরতের অনেক উপকার হবে।" Goodwin বলিল, "আমার ত ওখানে থাকার খরচা নেই।" স্বামিজী বলিলেন, "ওর জন্যে কিছু তোমায় ভাবতে হবে না। আমিই দোব।" প্রথমে সে কিছুতেই টাকা নিতে রাজি হয় নি, পরে সম্মত হয়, পুনরায় স্বামিজী তাহাকে

বলিলেন, "মহিমকেও (বর্তমান লেখক) সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমরা তিন জনে একসঙ্গে ওখানে চলে যাও। লণ্ডন অপেক্ষা নিউইয়র্কে অনেক কিছু শিক্ষা করবার বিষয় আছে। ওখানে সব সময়েই একটা স্বাধীন শক্তিপূর্ণ ভাব রয়েছে, কিন্তু লণ্ডনে মানুষ এত সতেজ হয় না। আরও একটা সুবিধা আছে যে সেখানে অমুকের বাড়ীতে থাকলে, তোমাদের তারা খুব যত্ন করবে।" স্বামিজীর এই সময় বিদ্যুতের উপর বড় আস্থা ছিল। আমেরিকাতে বৈদ্যুতিক কলকব্জা ও নানা প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। সর্বদাই তিনি বলিতেন, "America is full of electricity।" তাঁহার তখন ইচ্ছা ছিল যে ভারতীয়গণ আমেরিকায় electricity শিক্ষা করিয়া ভারতে সেই ধারা প্রচলিত করিতে যত্নবান হউক। ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক কাজকর্ম চলিলে দেশের বহু কল্যাণ হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস। এইজন্য বর্তমান লেখককেও পুনঃপুনঃ আমেরিকায় গমন করিয়া বৈদ্যুতিক শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান লেখক তখন লণ্ডনে বিখ্যাত পাঠাগার British Museumএ পাঠ করিতেছেন, সেইজন্য উহা ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন না।

Goodwin বর্তমান লেখককে আমেরিকায় সাথী করিবার জন্য কয়েকদিন বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল। কখনও মিষ্ট কথায়, কখনও গালাগালি দিয়া, কখনও বা হাস্য-কৌতুকে, নানাভাবে উহার মত বদল করাইতে বৃথা চেষ্টা করিল। সে বলিল, "এখানে থাকলে তোকে মেরে ফেলব। চ, আমেরিকায় চ। সেখানে নতুন দেশ, নতুন ভাব দেখে বেশ আনন্দ পাবি। ওখানে তোকে Edisonএর কাজে নিযুক্ত করে দোব। আমার তার (Edison) পরিচিত লোকের সঙ্গে জানা আছে।" কখনও সারদানন্দ স্বামী দুঃখিত ভাবে বলিতেন, "তাইত মহিম! লণ্ডনে আছি, স্বামিজীর লেকচার শুনছি। আবার এখন এখান ছেড়ে আমেরিকায় যেতে হবে,

সেখানে আবার লেকচার দিতে হবে। জানইত আমার লেখা পড়া কিছুই জানা নেই, যাহোক, স্বামিজীর আদেশ মত ঠাকুরকে প্রণাম করে একবার দাঁড়িয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করবো। যদি ভাল হয়, সেখানে থেকে যাবো। নইলে, এক চোঁচাঁ দৌড় মেরে কলকাতায় পালাব। এ সব উৎপাত কেন বাপু? দিব্বি মাধুকরী করবো, এক জায়গায় পড়ে থাকবো। এ আবার লেকচার করবার হাঙ্গামা মাথায় কেন গেল? আমি ত জীবনে কখনও লেকচার দিই নি, তবে দাঁড়িয়ে একবার বলবো। আর, গালমন্দ খাওয়া ত চিরকাল অভ্যাস আছে, না হয় আবার গাল খাব। তবে নরেন যখন বলছে, তখন একবার চেষ্টা করবো।"

* [অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সকলের জ্ঞাতব্যের জন্য এই স্থলে স্বামিজীর খিট্ খিটে স্বভাবের কারণ লিখিত হইতেছে। তাঁহাকে সারাদিন ও অর্ধরাত্র পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি অনেক সময়ে বলিতেন, "আমি যে রকম খাটি, তাতে দশটা লোকের মাথা পাগল হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত যে মাথাটা ঠিক আছে, এটাই আশ্চর্যের বিষয়।" এইজন্য মধ্যে মধ্যে তিনি খিট্‌খিটে স্বভাবের পরিচয় দিতেন। তাঁহার মহান্ শক্তির সমান তালে চলিতে অপরে কিছুতেই সক্ষম হইত না। কখনও সারদানন্দ স্বামীকে, কখনও বর্তমান লেখককে, কখনও Goodwinকে অজস্র তীব্র ভর্ৎসনার বাণী বলিতেন। শরীরে নানা কারণে ক্লান্তি বোধ করিলে তিনি ঐরূপ কঠোর বাক্য ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত পূর্ব কথা বিস্মৃত হইয়া পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতেন। ঐ তিরস্কার বাণী কাহারও মনে থাকিত না, কিম্বা কেহই উহার কোন-রূপ প্রতিবাদ করিত না। যাঁহারা স্বামিজীর সহিত একত্র বসবাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহা ছিল তাঁহার স্বভাবের একটি অঙ্গ বিশেষ। কারণ, শক্তিমানের শক্তির সামান্য একটু বিপর্যয় ঘটিলেই,

তাহার শরীর ও মনের বিশেষ যাতনা হইয়া ক্রোধের উদ্রেক হয়, কিন্তু ঐ ভাবটি ক্ষণমধ্যেই উপশমিত হয়। চিরন্তন ক্রোধ স্থায়ীরূপে হয় না। এই ভাবটির বিষয় জানা বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ স্বামিজী-চরিত্র জ্ঞান অসম্পূর্ণ হয়। তাঁহার লিখিত 'পত্রাবলীতে' ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও পরিচয় বহুস্থানে বহুলভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইংরাজদিগের ধর্মগ্রন্থ Bible পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে Paulএরও এইরূপ ক্রোধী স্বভাব ছিল। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী পাঠে ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়। অনেক স্থলে Paul প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া সকলকে গালি দিতেছেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই শান্ত হইয়া সকলকে মধুর স্নেহাশীর্বাদ করিতেছেন। ক্রোধী স্বভাব শক্তিমানের একটা লক্ষণ, তাহাতে প্রতি-হিংসা বা অবহেলার ভাব থাকে না। শক্তিহীন লোক মৃদু বিনয়ী ও দাস্যভাবে অভিভূত হয়। স্বামিজী দাস্যভাবাপন্ন ছিলেন না, তিনি একজন প্রকৃত ডিক্টেটর ভাবের লোক ছিলেন। সকল সময়েই তিনি ঐভাবে কথা বলিতেন, যথা, 'my people,' 'my country।' একবচন ব্যবহার করিতেন, বহুবচন ব্যবহার করিতেন না। ক্রোধ-হীন, ধীর, নম্র, বিনয়ী বাঙ্গলাদেশের ভক্তের ভাব লইয়া কেহ যেন স্বামিজীকে বুঝিবার চেষ্টা না করেন।] *

ক্রমেই আমেরিকা যাত্রার দিন সন্নিকট হইতে লাগিল। সারদা-নন্দ স্বামী বস্ত্রাদি একটা পোর্টমেণ্টের মধ্যে রাখিয়া প্রস্তুত হইলেন। স্বামিজী কয়েক পাউণ্ড Goodwinকে দিলেন। লিভারপুল হইতে জাহাজে চড়িয়া নিউইয়র্ক গমন করিতে হইবে। সব বন্দোবস্ত স্থির হইল। তিনি বলিলেন, "এখানে থাকার চেয়ে মহিমের নূতন দেশ আমেরিকাতে যাওয়াই ভাল। ইংলণ্ডটা পুরানো, মস্তবড়

* টীকা—গ্রন্থকার।

conservative place। সব বিষয়ে কেমন একটা জড়সড় ভাব, পুরাণ চালে চলে। আমেরিকাটা full of electricity and life; ওখানে থাকলে লোকে আপনিই চন্‌চনে হয়ে ওঠে। দেখনা, ইউরোপের কন্টিনেণ্ট থেকে গরীব লোকগুলো পুঁটলী ঘাড়ে করে নিউইয়র্কে নামলো। ভয়ে ভয়ে রাস্তা চলছে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, কোনও হোটেলে যেতে সাহস করে না। মাস দুই পরে দেখা গেল যে, সেই লোকটাই ভাল পোষাক পরেছে, গটমট করে রাস্তায় চলছে, পূরোদস্তুর একটা স্বাধীন আমেরিকান হয়ে গেছে। আমেরিকানদের ভেতর একটা প্রদীপ্ত জীবন আছে, একটা তেজ আছে। মহিমেরও ওখানে যাওয়া দরকার।" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া স্বামিজী অন্যত্র চলিয়া গেলেন। Goodwin তখন সিংহের মত গর্জন করিয়া, স্বামিজীর মত রাগ করিয়া, ঘুসি পাকাইয়া বর্তমান লেখককে বকিতে লাগিল, "মারব ঘুসি, দাঁত ভেঙে দোব, নাক ভেঙে দোব। চ আমেরিকায়। তিনজনে মিলে যাব। জাহাজে খুব ফুর্তি করব" ইত্যাদি। উত্তরে লেখক বলিলেন, "আমেরিকাতে সব ভাল বটে, কিন্তু লণ্ডনে British Museumএর Library কুত্রাপি নেই। এটা ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে ইচ্ছা নেই। তবে যদি একান্তই যেতে বলো, তাহলে যাব"।

Goodwin স্বামিজী প্রদত্ত জামা পরিল (অর্থাৎ গলা হইতে হাঁটু পর্যন্ত পোষাক পরিল), সারদানন্দ তাহার মাথায় একটি কাপড় বাঁধিয়া দিল। আলমারির উপর cupboardএ (আরসিতে) নিজের আকৃতি অনেকটা ভারতীয়ের মত হইয়াছে দেখিয়া, সে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। হঠাৎ তাহার মনে হইল যে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, বাড়ীর বুড়ী ঝির সঙ্গে দেখা করিয়া ঝগড়া করিতে হইবে। সে বড় কৌতুকপ্রিয় ছিল। ভারতীয় পোষাকটি পরিয়া সে নীচে রান্নাঘরে যাইয়া বুড়ীকে বলিল, "I am জ্ঞানী, জ্ঞানী। I am not ভক্ত।" বুড়ী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে

নাই। বুড়ীকে রাগাইয়া কিছু পরে উপরে আসিল এবং পরদিন প্রাতে Goodwin ও সারদানন্দ লিভারপুল হইতে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। Goodwinএর মন জ্ঞানের দিকে বেশী আকৃষ্ট থাকায় উহার সন্ন্যাসী নাম ছিল 'জ্ঞানানন্দ'।

লেখককে আমেরিকার বিষয়ে সারদানন্দ স্বামী পরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে প্রদত্ত হইল। তিনি একসময়ে গল্প করিতে করিতে বলিলেন, "আরে ভাই, আমি ত ভাল লেখাপড়া জানতাম না, আর লেকচারও কখনও করি নি। কিন্তু নরেনের তাড়নার ভয়ে লেকচার দিতে হবে। আবার নরেন যেরকম রাগী—হয়ত সকলের সুমুখেই মেরে বসবে। ইংরাজিতে লেকচার দোব কি, ইংরাজিতে কথা কইতেই আমার আটকে আটকে যায়। কিন্তু কি করি, নরেনের হুকুম। আমি মনে করলুম যে, আমেরিকায় গিয়ে একবার ত ভঙ্গীটঙ্গী করে দাঁড়িয়ে লেকচার করতে উঠব, পারি ত ভাল, না পারি ত অমনি জাপান দিয়ে সটকাব। আর এদিকে আসব না। এক চোঁ চাঁ দৌড় মেরে—দেশে গিয়ে পৌঁছাব। যা থাকে কপালে, বাবা। যখন সে বলেছে, তখন যাত্রাদলের দোঁহারের মত একবার গাইতে উঠব। গাওনা কেমন হবে, তা কিছুই জানি না। তারপর মনে পড়ল, Goodwin বইগুলো ছাপাচ্ছে। তার ফর্মাগুলো সঙ্গে নিয়ে জাহাজে বসে খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলুম—যেন পরীক্ষা দিতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে খুব করে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলুম। মনে মনে তাঁকে প্রার্থনা করে বললাম—আমার না হোক, অন্তত নরেনের যেন মুখরক্ষা হয়। কারণ, নরেন আমাকে পাঠাচ্ছে, কাজ যদি খারাপ হয়, তাহলে নরেনের দুর্ণাম হবে। নিউইয়র্কে যথা সময়ে গেলুম। Goodwin সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে, বোষ্টনের নিকট কেম্ব্রিজ গ্রামে বিখ্যাত বেহালা-বাদক Mrs. Ole Bull (অলিবুল)এর বাড়ীতে নিয়ে গেল। Ole Bull জাতিতে সুইডিস ও আমেরিকান প্রজা ছিলেন।

তাঁর অদ্ভুত জীবনচরিত গ্রন্থখানি (Memoirs of Ole Bull by Mrs. Sarah C. Bull) আমাকে উপহার দেয়।" (বেলুড় মঠে ইহা প্রদত্ত হয়)।

যাহা হউক উক্ত Mrs. Bullএর বাড়ীতে একটি ছোট রকম 'Conference of Religion' হয়। অনেক সম্প্রদায়ের লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। দর্শনের বিখ্যাত পণ্ডিত Prof. James ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সারদানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তাঁহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। ধীর, নম্র ও বিনয়ী হওয়ায় সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। Sturdy ও Foxএর নিকট লণ্ডনে প্রথমে দু'একখানি পত্রে লেখা আছে দেখা যাইত—'ইনি বিবেকানন্দ স্বামীর মত প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও খুব ধীর, নম্র ও বিনয়ী সাধু।' পরের পত্রে লেখা ছিল, 'সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির চক্ষে দেখিতেছে।'

সারদানন্দ স্বামী একবার লেখককে বলিয়াছিলেন, "কোনও একটা স্থানে তাঁবুতে বড় একটা সভা হয়। এতবড় সভাতে লেকচার দেওয়া পূর্বে আমার অভ্যাস ছিল না, কিঞ্চিৎ চঞ্চল হই। সঙ্গী Goodwinও নাছোড়বান্দা। নানাভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিল। লেকচারও একরকম বলা হইল। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে ও শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে শুনিল। Goodwinএর আহ্লাদ দেখে কে? তিনি আরও বলিয়াছিলেন—গীতা ও চণ্ডীর ভাব নিয়ে কয়েকমাস লেকচার দিলাম। ক্রমে ক্রমে সব ভাব শেষ হ'লে মহা ফাঁপরে পড়লাম। একই কথা বারবার বললে লোকেই বা শুনবে কেন? ঠাকুরকে খুব ডাকতে লাগলাম, কয়েকদিন পরে বুকে একটা অসীম সাহস এলো। নূতন উদ্যমে লেকচার করতে লাগলাম। বক্তৃতাও বেশ জমেছিল। অনেক লোকও শুনতে আসত। মুখও বেশ খুলে গেল। বাজারটাও বেশ জমেছে। মনে ভাবলুম

যে, বছর কতক এখানে থাকব। আরে বলব কি কপালের কথা, তোমার দাদার জন্যই ত সব মাটি হয়ে গেল। হঠাৎ বেলুড় মঠ থেকে এক পত্র গেল—তুমি আমেরিকার মহিলাদের নিয়ে কলকাতায় ফিরে এস। আদেশ বাণী, কি করব? লেকচার করা ত খতম হোল। তল্পিতল্পা গুছিয়ে আমেরিকার স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চলে এলুম। আমার লেকচার পালাও সাঙ্গ হোল। বেশ কিন্তু সব জমেছিল। সব গেল ভেঙে। আমি লেকচারও বুঝি না, কাজও বুঝি না, স্বামিজীর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র কারণ। আমি আমার কাজ করেছি।"

এই সামান্য উপাখ্যান হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, সারদানন্দ স্বামিজীকে কি গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন—তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করা নিতান্ত দোষনীয় মনে করিতেন। মান, যশ, প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। স্বামিজীর প্রতি এইরূপ ঐকান্তিক ভালবাসা অতি অল্পমাত্রায় দেখা যায়। অথচ তিনি সর্বকার্যে যোগ্য ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। ধীর ও বিনয়ী ছিলেন বলিয়া তিনি আত্মশক্তি ও আত্মকথা কখনও প্রকাশ করিতেন না। নিজের বিষয় কোনও কথা উঠিলে তিনি দীনভাবে উহা বন্ধ করিয়া দিতেন। এইটি ছিল তাহার বিশেষ মহত্ব। তিনি যে একজন উচ্চাবস্থার লোক, বিনয়ী, একনিষ্ঠ ও স্বামিজীর বিশেষ অনুগত ছিলেন তাহা জীবনে বর্ণে বর্ণে প্রকাশ করিতেন।

রাজযোগ বিষয়ক বক্তৃতা

লণ্ডনে স্বামীজী প্রত্যেক দিন রাজযোগের বিষয়ে তুইবার করিয়া বক্তৃতা দিতেন। Goodwin সমস্ত বক্তৃতাগুলি লিখিয়া লইত। যদিও স্বামীজী রাজযোগের সুত্রগুলি অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে অল্প পরিমাণে ব্যাখ্যাও লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যখন বক্তৃতা দিতে উঠিতেন তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া যাইতেন। তখন তিনি স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ করিতেন। তাঁহার গলার স্বর, মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি সমস্তই স্বতন্ত্র হইয়া উঠিত। অতি গম্ভীর, মধুর, আজ্ঞাপ্রদ, স্নিগ্ধকর ভাব প্রকাশ পাইত। ফটোতে স্বামীজীর যে মুখের চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়, বক্তৃতাকালে কিন্তু সেরূপ দেখা যাইত না। স্বতন্ত্র চেহারা হইয়া যাইত, মুখের দিকে চাহিবার কাহারও সামর্থ থাকিত না। বাংলা দেশের নরেন্দ্রনাথ দত্ত আর নয়। কিন্তু পূর্বদেহের ভিতর বিবেকানন্দ নামক এক মহাশক্তি প্রকাশ পাইতে থাকিত। সে শক্তি যেন অপর সমস্ত শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সকলের উপর স্থির হইয়া প্রকাশ পাইত।

এরূপ কেহ ধারণা না করেন যে, স্বামীজী কতকগুলি যুক্তি-তর্ক দিয়া রাজযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যিনি এরূপ ধারণা মনে পোষণ করিবেন, তিনি স্বামীজীকে মোটেই চিনিতে ও বুঝিতে পারিবেন না; তাহা ছাড়া স্বামীজীর সম্বন্ধে তাহার একটি মহা ভুল ধারণা চিরকাল থাকিয়া যাইবে। স্বামীজী প্রত্যেক কথায় বলিতেন, "I never preach which I do not practise অর্থাৎ আমি জীবনে যাহা সাধনা করি নাই, তাহা লোকসমক্ষে কখনও প্রচার করি নাই। আমি যে সব ক্রিয়া উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই তোমাদের বলিতে চাই।" তাঁহার নিজের সাধনের অবস্থা, নিজে কি ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন এবং সাধনকালে নানাপ্রকার

সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাব কিরূপে উদয় হইয়াছিল, কিরূপে তাঁহার ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয়ই যে তিনি বক্তৃতা-কালে শুধু বলিতেন, তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দকে সেই সকল বিষয় অল্পবিস্তর উপলব্ধি করাইয়া দিতেন। স্বামীজীর রাজ-যোগের বক্তৃতা শুনিতে আসা আর দেড় ঘণ্টাকাল স্থিরভাবে বসিয়া ধ্যান করা একই কথা ছিল। প্রত্যেকেই নিজের অন্তরে, স্বামীজী যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই সময় অনেকটা সেইরূপ উপলব্ধি করিতেন। হাতে করিয়া ধ্যান করান, এই ভাবটি তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ পাইত। Goodwin কেবলমাত্র উপদেশগুলি লিখিয়া রাখিত, কিন্তু সাধারণ লোকের স্বামীজীর কথার দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকিত না। বর্তমান লেখকের যাহা এখন স্মরণ হইতেছে এবং যাহা ঠিক ঠিক বলিয়া মনে করিয়াছেন, সেইগুলি লিখিয়া যাইবেন। Goodwinএর লেখাগুলি সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় তাহা আর পাইবার কোন আশা নাই। তাহার লেখার সহিত বর্তমান লেখকের লেখার তুলনা করিলে হিমালয় পর্বতের নিকট বালির কণা বলিয়া বোধ হইবে। তবে কিছু না পাওয়ার চাহিতে যৎসামান্য যাহা বর্তমান লেখকের মনে আছে, তাহা থাকা মন্দ নয় এবং এখন সেইটাকেই আদর করিয়া লইতে হইবে।

ধ্যান করিবার প্রথা—একদিন স্বামীজী ধ্যান করিবার বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। The hip, the spinal column and the head should be kept erect অর্থাৎ কোমর, মেরুদণ্ড ও মস্তক ঠিক সিধা থাকিবে। ধ্যান করা, মাটিতে চেপ্‌টানি খাইয়া বসিয়া হইতে পারে, চেয়ারে বসিয়াও হইতে পারে বা পিঠের উপর শুইয়াও হইতে পারে। আসন লইয়া বা বসিবার প্রণালী লইয়া যে অনেক গোলযোগ বা কঠোর নিয়ম আছে, সেইটা তত আবশ্যক নয়। যাহার যে আসনে বসিলে সুবিধা

হয়, তাহার সেই আসনে বসিয়া ধ্যান করাই ভাল ; শুধু মেরুদণ্ড ও অপর দুই অংশ সমান সূত্রে রাখিলেই হইবে। স্বামীজী একখানি চেয়ারের উপর পায়ের উপর পা দিয়া "পদ্মাসন" অবস্থায় বসিয়া সকলকে বলিলেন যে, চেয়ারের উপর পা রাখিয়া সাধারণ ভাবে বসিলেই হইবে। তাহার পর তিনি ভ্রূর মধ্যে জ্যোতির্ময় বিন্দু নিরীক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয় অনেক বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার কথার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "নিজের সম্মুখে বসিয়া চোখে চোখে চাহিয়া আছি এরূপ ভাবে ধ্যান করিলে অনেক ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিজে স্থূল শরীরে বসিয়া আছি এবং নিজেই অন্য একটি দেহ হইয়া সম্মুখে আছি এবং পরস্পর পরস্পরকে দেখিতেছি।" তিনি আরও একটি প্রণালী বলিলেন যে, নিজের দেহটা মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং সেই দেহটা নিজেই দেখিতেছি, এরূপ ভাবে ধ্যান করিলে স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রভেদ শীঘ্রই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ইহা একটু বিশেষ কষ্টকর। নিজের ইষ্ট সম্মুখে আছেন, তাঁর কাছে সংযত ভাবে বসিয়া আছি, তৎপরে আমার ইষ্টই আমার দেহতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছেন, ক্রমশঃ এক দেহতেই ইষ্ট ও ভক্ত রহিয়াছে ; কখন বা ইষ্টের দেহতে ভক্ত সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করিতেছে এবং তদবস্থায় থাকিয়া ইষ্টের ভিতর হইতে ভক্ত তাহার পূর্বতম স্থূল শরীরকে দেখিতেছে, এইরূপ নানাপ্রকারে উলট-পালট করিয়া দর্শন হইলে সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর হইতে শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়।

সম্মুখে জ্যোতির্ময় বিন্দু রাখিয়া ধ্যানের বিষয় তিনি বলিলেন যে, এইভাবে ধ্যান করিতে যাইলে প্রথম প্রথম মাথার পিছন দিকে দপ্‌দপ্‌ করে, মাথার একটা কষ্ট হয়। তখন ধ্যান করা বন্ধ করিয়া দিবে। জোর করিয়া ধ্যান করা ভাল নয়, তাতে অনেক সময় গতিরোধ হয়।

ঈড়া ও পিঙ্গলার ভিতর কি করিয়া শক্তি প্রবেশ করে বা পথ খুলিয়া দেয়, তৎবিষয়ও তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। ধ্যান করিতে করিতে যখন শক্তি ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার কাছে যায়, তখন মনে হয় যেন শিরাগুলিকে চিরিয়া ফেলিতেছে বা একটা লোহার তারকে খুব লাল ডগ্‌ডগে্‌ করিয়া মাংসের ভিতর বিঁধিয়া দিলে যেমন যন্ত্রণা হয়, তখন ঠিক সেই রকম যন্ত্রণা হয়। সেই সব সাধনকালে খুব প্রস্রাব ও কপালে ঘাম হয়, অবশ্য তাতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। যখন মাথার পিছন দিকে দপ্‌ দপ্‌ করিবে তখনই ধ্যান করা বন্ধ করিয়া দিবে; একেবারে জোর করিয়া ধ্যান করিবার আবশ্যক নাই।

বিন্দু রাখিয়া ধ্যান করা—স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "বিন্দু রাখিয়া ধ্যান করিবার সময় প্রথমে চোখের সম্মুখে কাল কাল কতকগুলি দাগ বা গোটা মাছির মত উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখা যায়, কিন্তু সবগুলিই পৃথক পৃথক ভাবে। তাহারপর সেগুলি ফ্যাকাশে সাদা বা জোনাকীর মত উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিবার চেষ্টা করে; ক্রমশঃ চঞ্চল ভাব ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে। অবশ্য সমস্তই ধ্যানের উপর নির্ভর করে। যেমন যেমন ধ্যান গভীর হইবে, এগুলিও সেইরূপ মূর্তি ধারণ করিবে। তাহারপর সমস্তগুলি ক্রমশঃ জুড়িয়া যায় এবং ধীরে ধীরে একটি অস্পষ্ট ধোঁয়াটে রঙের রূপ ধারণ করে। এই রূপটি প্রথমে যেন স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে না, অস্পষ্ট ও ফ্যাকাশে রঙের মত দেখাইবে। ক্রমশঃ স্থির ভাব আসিবে এবং অস্পষ্ট ভাবও চলিয়া যাইবে। তখন যেন একটা স্পষ্ট কোন জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়; তবে রঙ্‌টা ফ্যাকাশের মত থাকে এবং জ্যোতির্ময় বা প্রদীপ্ত রংএর দিকে গতি হয়। তাহারপর স্পষ্ট, দীপ্তিশালী বা effulgent কোন বস্তু সম্মুখে দাঁড়ায়। ধ্যানটা যেদিন যেরূপভাবে গভীর হইবে, সেইদিন এই ছবি বা মূর্তি সেই পরিমাণে স্পষ্ট হইবে এবং ভিতরকার

শক্তি যেরূপভাবে কমিয়া কমিয়া যাইবে, এই পরিলক্ষিত ছবি বা দৃশ্যও সেইভাবে কমিয়া যাইবে।"

অধ্যাস (Self-projection)—মন যখন নিজে সুষুম্নার ভিতর যায়, সেইটি বহির্মুখে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ চিদাকাশে একটি projection বা অধ্যাস প্রতিবিম্বিত হয়। মন যে পরিমাণে সুষুম্নার ভিতর যাইবার চেষ্টা করিতেছে, অধ্যাস বা self-projectionও সেইভাবে হইতেছে এবং ক্রমেই অধ্যস্থ বা self-projected দৃশ্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠে। রূপ, রং ও আয়তন এই অধ্যস্থ বা self-projected দৃশ্যে সমস্তই আছে। আমরা যে আশীর্বাদ লই এবং আশীর্বাদ যে পাই, এইটা হইতেছে এই অধ্যস্থ বা self-projected দৃশ্যের নিকট লই এবং সেইটাই সফল হইয়া থাকে। তিনি সর্বদাই বলিতেন, "আগে হইতে কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিও না, সামান্য একটু সাধনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে ফল বুঝিতে পারিবে।"

আহার—আহার সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেন, "এই সময় উত্তেজক সামগ্রী আহার করা উচিত নয়। ভাত, রুটী, দুধ, কলা, ফল এইরূপ আহার করাই শ্রেয়ঃ। মাছ, মাংস না খাওয়াই ভাল, উপবাস করিবার দরকার নাই। দুধ, রুটী, ফল, মাখন তিনবার, চারবার, পাঁচবার খাইতে পার। অল্প করিয়া আহার করা উচিত, চাপাচাপি করিয়া আহার করা ভাল নয়। যাহাতে পেটে বায়ু না হয় এবং শরীরে আলস্য না আসে, এইটি লক্ষ্য করতে হয়। যাহাতে মন পবিত্র থাকে, সেইরূপ খাদ্য আহার করাই উচিত। এই সামান্য কয়টা নিয়ম যথারীতি পালন করিতে পারিলে মন শীঘ্রই ধ্যানমার্গে অগ্রসর হয়।" মাংস খাওয়া ও নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, "সিংহ মাংস খায়, সব সময় চঞ্চল, শক্তি তাহার বহির্মুখী হইতেছে। হাতী উদ্ভিদ খায়, স্থির হইয়া এক জায়গায় থাকে। ধ্যান করবার সময় মাংস না খাওয়াই ভাল,

কারণ তাহা হইলে মন চঞ্চল হয় ও এককেন্দ্রে সংযত হওয়ার একটু অন্তরায় হয়।" স্বামিজী তিন চার দিন তুইবার করিয়া ধ্যানের বিষয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় মনে রাখা সম্ভব নয়, অল্পবিস্তর যাহা কিছু স্মরণ আছে, তাহাই লিখিত হইল।

সাধনের প্রথম অবস্থায় আহারের বিষয় একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ধ্যানের ঘর—একদিন স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "যাহাদের সামর্থ আছে, তাহারা যেন একটি বিশেষ আলাদা ঘর করিয়া রাখে। কিন্তু যাহাদের অবস্থায় কুলায় না, তাহারা যেন নিজেদের শয়ন-ঘরেই একটু ধ্যান করিবার ব্যবস্থা করে। ধ্যানের ঘরে যেন কোন বাজে কথাবার্তা বা সাংসারিক বিষয় আলোচনা না হয়। সে ঘরে যেন বিপরীত ভাবের বা উদ্দেশ্যের লোক না প্রবেশ করে। ভগবৎ চিন্তা ছাড়া যেন সে ঘরে অন্য চিন্তাই না হয়। হাস্যকৌতুক বা চাপল্যভাব একেবারেই নিষেধ। ঘরটি যেন উপাসনার স্থান বলিয়া সদা সর্বদা স্মরণ থাকে। সেই ঘরটিতে কিছু ফুল, ধূপ, ধূনা দিয়া পবিত্র রাখিবে। ঘরটির বায়ু যেন পবিত্র হয়, তাহা হইলে মনও স্বভাবতঃই স্থির হয়। ঘরেতে সম্প্রদায় হিসাবে সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের ছবি বা কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন রাখাও ভাল, কারণ এই সকল আনুষঙ্গিক বস্তু মনেতে শ্রদ্ধার ভাব আনিয়া দেয়।"

আসন—"জপ, ধ্যান করিবার সময়ে নিজস্ব আসনটিতে প্রত্যহ বসিবে। সেই আসনে যেন অপর কেহ না বসে এবং নিজেও ভিন্ন ভিন্ন দিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিবে না। কারণ এক আসনে কিছুকাল ধরিয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে অনবরত জপ করিলে, সেই আসনের ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে জপের শক্তি লুক্কায়িত থাকে। যেদিন মনটা প্রথম প্রথম কিছু চঞ্চল থাকে বা শ্লথ হইয়া যায়, সেদিন আসনের ভিতর হইতে জপের সেই প্রচ্ছন্ন বা অন্তর-নিহিত শক্তি জাপকের জপকে প্রণোদিত করিয়া তুলে অর্থাৎ সেই সময় খুব সহায়ক হয়।

সেইজন্য এক আসনে জপ করা আবশ্যক এবং আসনকে সর্বদা পবিত্রভাবে রাখিবে।

ধ্যান করিতে বসিবার সময় জগতের সকলের মঙ্গলের জন্য সর্বদিকে শুভ বা মঙ্গল ইচ্ছা প্রবাহিত করিবে; অর্থাৎ সকলের মঙ্গল হউক—এইরূপ শুভ ইচ্ছা মনে মনে কামনা করিবে। কারণ, সকলের মঙ্গল চিন্তা করা বা সকলের মঙ্গল হউক—এইরূপ চিন্তা করিলে মন উদার হয়।"

* [সকলের মঙ্গল চিন্তা করিলে এবং এই চিন্তা আন্তরিক ভাবের হইলে, সেই সকল চিন্তার স্পন্দন জাপকের বা ধ্যানীর কেন্দ্রেতে প্রতিঘাত করে অর্থাৎ সেই সকল সৎচিন্তা পুনরায় সেই ব্যক্তির মনেতে প্রবেশ করে এবং সেইজন্য মনও অনেকটা প্রশস্ত শান্তভাবাপন্ন হয়।] *

ধ্যান-ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে নিজের ইষ্টের নাম জপ করিবে। সাধারণতঃ বাড়ী বা অন্যস্থানে জপ তেমন জমে না, কিন্তু মন্দির বা কোন বিশেষ সাধকের স্থানে জপ সহজে জমে। ইহার কারণ কি? মন্দির বা তীর্থস্থানে এত মাহাত্ম কেন? অনেক সিদ্ধপুরুষ ও সজ্জনেরা সেই সব স্থানে বহুদিন ধরিয়া শান্তিপূর্ণ মনে ভগবচ্চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। নিয়ম হইতেছে যে, জপ, ধ্যান করিবার কালে শরীর হইতে এক রকম সূক্ষ্ম বা পবিত্র শক্তি (fine vibration) উদ্ভুত হয় এবং সেই স্থানের সকল বস্তুতে বা দেয়ালের গায়ে লাগিয়া থাকে। হয়তো সেই সকল লোক এখন বিদ্যমান নাই, কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাশক্তি সহজে বিনষ্ট হইবার নহে। মন্দির বা তীর্থ-স্থানের দেয়ালের গায়ে সেই সকল চিন্তা-শক্তি লাগিয়া থাকে, যেন দেওয়ালের গায়ে সেই সকল চিন্তার স্পন্দন সকল স্থিরভাবে রহিয়াছে। পাছে এই সকল চিন্তার স্পন্দন বিপরীত ভাবের চিন্তার

* টীকা—গ্রন্থকার।

দ্বারা মলিন হইয়া যায়, সেইজন্য তীর্থস্থানে বা মন্দিরে যাইয়া ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করা নিষেধ। কোন নূতন ব্যক্তি সেইস্থানে যাইয়া ধ্যান বা জপ করিতে বসিলে বা ভগবচ্চিন্তা করিতে গেলেই, দেয়ালের গায়ের সেই সকল প্রচ্ছন্ন চিন্তার রেখা নূতন ব্যক্তিকে আবরণ করে এবং তাহার ভগবৎপ্রীতি বা জপ-ধ্যান পরিবর্দ্ধিত ও গভীর হয়, মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়। ইহাকেই বলে জীবন্ত তীর্থস্থান, জীবন্ত মন্দির। যেস্থানে উক্ত চিন্তাশক্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানও মৃতপ্রায় হইয়া যায়, সেখানে সচরাচর সাধকের আগমন হয় না। সকল তীর্থস্থানই এই প্রকারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সর্বদেশে সর্বধর্মের ভিতর ইহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে কোন এক ব্যক্তি একটি নিভৃত পর্বতগুহার ভিতর বসিয়া একা বহুদিন ধরিয়া জপ ধ্যান করিয়া দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কেহই তাঁহার নাম, ধাম বা পরিচয় কিছুই জানে না। কিন্তু একজন উচ্চাবস্থার সাধক যদি সেই গুহার ভিতর যায়, তাহা হইলে সেই সাধক গুহার ভিতর ঢুকিলেই সেই স্থানকে সিদ্ধ স্থান বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারে; সেইস্থানে যে পূর্বে একজন সিদ্ধ পুরুষ বাস করিয়াছিল, তাহাও সে বলিয়া দেয়; কারণ যে শক্তিটি সেখানে রক্ষিত ছিল, তাহাই তখন নবাগতকে আত্মপরিচয় দেয়। মন্দির বা তীর্থস্থানেরও এইরূপ হইয়া থাকে। যেখানে কু-চিন্তা বা কু-কার্য বা খুন্‌খারাপি হইয়াছে, সেখানে কোন সাধক যাইবামাত্রই বলিয়া দিতে পারে। সেইখান-কার দেয়ালের গায়ে সেই সব কু-ভাব সূক্ষ্মভাবে জড়িত থাকে, এইজন্য সেই সমস্ত স্থানে যাইলে মন মলিন হয় ও ত্রাসের ভাব আসে। সাধকের সেরূপ স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ। জপ হইতে যে শক্তি আসে তাহার রং হয় শুভ্র এবং ক্রমশঃ ফ্যাকাশে সাদা হইতে স্পষ্ট শুভ্রের দিকে যায়। কু-চিন্তা বা কু-ভাব হইতে যে

শক্তি আসে তাহা কালো হয় এবং ঐ কালো ক্রমশঃ গাঢ় কালোর দিকে যায়। সেইজন্য সর্বদেশে সৎকার্য বা সৎচিন্তাকে শুভ্র রং দিয়া বর্ণনা করিয়াছে এবং খুনী বা ভীষণ ভাবগুলিকে কাল রং দিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

জপ করা—অনবরত কোন পবিত্র শব্দ বা সিদ্ধ পুরুষের নাম জপ করিতে হয়। প্রথমে জপ যেন জিহ্বা করিতেছে বা বাহ্য শরীরটা জপ করিতেছে, কিন্তু অনবরত জপ করিতে করিতে জপটা অন্তর্মুখী হয় ও দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে। তখন জিহ্বা হইতে জপ মনে যায় এবং ক্রমশঃ দেহের সূক্ষ্ম স্নায়ুসকল সেই জপ করিতে থাকে। অনবরত জপ করিতে করিতে একটি শক্তি ভিতর হইতে উদ্ভূত হয়, তখন স্থূল শরীর পৃথক হইয়া যায়। শরীরটা তখন এত ভারী বা জড় বা আলস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণ অবস্থায় বিষাদ বা মলিন ভাব যাহা থাকে, তখন তাহা আর আসে না; শরীর তখন বেশ হালকা ও প্রফুল্ল হয়, সর্ববিষয়ে কার্য করিতে একটা সাহস আসে এবং দুরূহ ব্যাপার সকল সহজে বুঝিয়া লওয়া যায়। স্বামীজী বলিলেন, "আমি অনবরত জপ করিয়াছি, এমন কি আঙ্গুলের ডগায় পর্যন্ত জপ করিয়াছি। দেহের প্রত্যেক পরমাণুতে জপ করিয়াছি। স্থূল শরীরে জগতের বস্তুসম্পর্কের যে রূপ দেখা যায়, সূক্ষ্ম শরীরে গেলে সেই সকল জিনিষের অন্য প্রকার সম্পর্ক দেখা যায়, তাহা স্নিগ্ধ ও আনন্দপূর্ণ।

মন প্রথম প্রথম চঞ্চল হইয়া থাকে, সেইজন্য কোন ইষ্ট বা সিদ্ধ পুরুষ, যাঁহার উপর বা যাঁহাকে ভাল বলিয়া ধারণা আছে, তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখিতে হয়। এই শ্রদ্ধা মনটাকে খুব সংযত করে। তাঁহার বিষয় দিনরাত চিন্তা করিতে হয়, যেন তিনি নিকটে রহিয়াছেন, স্পর্শ করিয়া আছেন বা দেহের ভিতর কখন কখন মিশিয়া যাইতেছেন, এই সকল ভাব আসিলে সিদ্ধপুরুষের

বা ইষ্টের আরোপিত অনেক গুণ সাধকের ভিতর বর্তায়। শ্রদ্ধা সাধনমার্গের বিশেষ সহায়তা করে, তাহা না হইলে মনটি বড় চঞ্চল হয়। ধ্যান করিবার সময়ে ইষ্টকে মহীয়ান, শক্তিমান প্রভু বলিয়া সাধারণ লোকে ধ্যান করিয়া থাকে, কিন্তু যখন ইষ্টের সান্নিধ্য-জ্ঞান দৃঢ়ীভূত ও অচল হয়, তখন অনেক ভাবে ইষ্টকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কেহ বা মাতৃভাবে সাধনা করে এবং বল্লভ ভাবেও অনেকে সাধনা করিয়া থাকে। এই বল্লভ ভাবটি হিন্দুদেরই কেবল আছে তাহা নহে, খৃষ্টানদের ভিতরও ঐ বল্লভ ভাবের সাধনা আছে। সেণ্ট ক্যাথারাইন যীশুকে বল্লভ ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। বাৎসল্যভাবে সাধনা করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সুলভ। ইষ্ট যেন শিশু সন্তান হইয়াছে এবং তাহাকে আদর করিতেছে। এই ভাব যখন প্রগাঢ় ও ঘনীভূত হয়, তখন ছোট বড় জ্ঞান অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়; তখন ইষ্টকে সখা বা সহচর বলিয়াও জ্ঞান করা যায়। কিন্তু এইরূপ নানাপ্রকার ভাবের ফল হইতেছে শ্রদ্ধা।"

শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর অনেকে ইষ্টের এইরূপ নানাপ্রকার ভাব শুনিয়া আনন্দিত হইতে লাগিল এবং স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ বয়স্থা স্ত্রীলোকেরা বিশেষ আনন্দ করিতে লাগিল। তাহাদের তখন বুক হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল, কারণ তাহারা ভগবানকে প্রভু ও ত্রাসের কারণ বলিয়া বরাবর শুনিয়া আসিতেছিল। ভগবানকে "বল্লভ" বা "সন্তান" ভাবে সাধনা করা যাইতে পারে, এই কথা শুনিয়া তাহারা বড় আনন্দিত হইল এবং এই ব্যক্তিগত অনুরাগের কথা শুনিয়া সকলে খুসী হইল।

স্বামিজী বলিলেন, "অনবরত জপ করিতে করিতে মন উপর দিকে চলিয়া যায়। এক জায়গায় যাইয়া মন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, যেন আর কিছু দেখিতে পাইতেছে না বা কিছু করিতে পারিতেছে না, সব যেন শূন্য ও ফাঁকা, যেন জপ, ধ্যান

করিবার সামর্থ আর নাই, এরূপ অবস্থা হয়। এই জায়গাটিকে Point of Polarisation বলে। অনেকেই এইস্থানে ভয় পাইয়া যায়। কিন্তু এই স্থান ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা বা কৃপা বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া পার হইতে হয়, তাহা হইলে পুনরায় উচ্চতর গতি চলিতে থাকে। এই জায়গাটিতে ফেনোমেনন (phenomenon) নোমেনন (noumenon) হইয়া যায় অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন অতীন্দ্রিয় জগতের প্রাদুর্ভাব হয়। নিজের সামর্থে হউক বা সিদ্ধ পুরুষের কৃপায় বা সব উপায় একত্র করিয়া হউক, এই গণ্ডীটি পার হইতে হয়।

অনবরত জপ, ধ্যান করিতে করিতে মন যখন সূক্ষ্ম শরীরও পার হইয়া যায়, তখন ভিতর হইতে অন্তর্নিহিত শক্তি বা latent energy জাগ্রত হইয়া উঠে, ইহাকে ওজস্ বলে। এই ওজস্ নিম্নগামী হইলে, ইহা হইতে অন্য দেহ বা সন্তান উৎপন্ন হয়, কিন্তু যখন ইহা আবার উর্ধগামী হয়, তখন মন ব্রহ্মের দিকে অগ্রগামী হয়। এই ওজস্ এক এক প্রকার ইন্দ্রিয়ে যাইলে, এক এক প্রকারের প্রক্রিয়া হয়। চক্ষুর দিকে যাইলে সাধকের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি হয়। কর্ণে যাইলে 'দূরাৎ শ্রবণম্' হয়। নাসিকাতে যাইলে 'দূরাৎ ঘ্রাণম্' হয়, আর উর্ধে যদি মস্তকে সহস্রারে যায়, তাহা হইলে সমাধি হয়। এই ওজস্ সুষুম্নার ভিতর দিয়া পরিব্যক্ত হয়। স্বাভাবিক যাহার চক্ষুর দৃষ্টি প্রবল, ওজস্ প্রথমত তাহার চক্ষু দিয়া প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করে। তাহার পর নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তে পরিব্যক্ত হয়। যাহার কর্ণের শ্রবণশক্তি প্রবল, তাহার কর্ণেতে প্রথম ওজস্ প্রতিভাসিত হয়; তৎপরে অন্যান্য ইন্দ্রিয়তে পরিব্যক্ত হয়। অনেক খাদ্য আহার করিলেই যে ওজস্ হইবে, তাহা নহে। তাহা হইলে যাহারা অধিক পরিমাণে আহার করিতে পারে, তাহাদের ওজস্ হইত, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র। আহারের উপর ততটা নির্ভর করে না, আহার অল্প সহায়ক মাত্র

ওজস্ স্বতন্ত্র জিনিস। ইহা শুধু সুষুম্নার ভিতর হইতে অনবরত জপ বা তদনুযায়ী অন্য কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভুত হয়। ওজসের তারতম্যে বক্তার তারতম্য হয়। উদাহরণস্বরূপ একই বিষয় দুই ব্যক্তি বলিতেছে। একজনের কথা কেহ শুনিল না, বিশেষ মনও দিল না। কিন্তু অপর একজন সেই বিষয় বলিল, আর সকলে মন দিয়া শুনিল এবং তাহার কথা বিশ্বাস করিল। ইহার কারণ কি? এক ব্যক্তির ওজস্ নাই, সেজন্য কেহ তাহার কথা শুনিল না, তাহার কথা প্রাণহীন হইল এবং অপর এক ব্যক্তির ওজস্ আছে বলিয়া তাহার কথা জীবন্ত হইল, সকলে প্রাণ দিয়া শুনিল। এই ওজসের কথাগুলির উপর সাধু, মহাত্মা প্রভৃতির তারতম্য গণনা হয়।" এই ওজস্ সম্বন্ধে যেদিন বক্তৃতা হইয়াছিল, সেইদিন বক্তৃতাটি খুব গম্ভীর হইয়া জমিয়াছিল। সকলে যেন বুকে একটি সাহস পাইতে লাগিল এবং দুর্বলভাব চলিয়া গিয়া সকলের বুকে একটি বল আসিতে লাগিল।

অপরের মনের কথা বলা (Thought-reading)—অপরের মনের কথা (Thought-reading) বলিয়া দেওয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে উঠিল। স্বামিজী বলিলেন যে, এটা কিছু বিশেষ শক্ত কাজ নয়, দিনকতক চেষ্টা করিলেই ইহা হইতে পারে। প্রথমে নিজেকে বিদেহে বা সূক্ষ্ম শরীরে আনিতে হয়; নিজেকে active এবং দ্রষ্টব্যকে passive ঠিক করিতে হয়। তারপর সূক্ষ্ম শরীরে বা বিদেহ অবস্থাতে অপর ব্যক্তির passive শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। তাহা হইলে অপর ব্যক্তির মনে যা কিছু ভাব উদয় হইতেছে, সব বলিয়া দেওয়া যায়। কোন জিনিষ লুকাইবার আর তখন থাকে না; তবে এ কাজটা ভাল নয়। সাধু মহাত্মাদের মনে প্রবেশ করিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়, মনটির উচ্চদিকে গতি হয়। কিন্তু যদি মাতাল, খুনী ইত্যাদি ব্যক্তির মনের ভিতর প্রবেশ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের কদর্য

ভাব সকল নিজের উপর বর্তায় এবং কিছুদিন এইরূপ নীচলোকের মনের ভিতর প্রবেশ করিলে, স্বভাবতঃ একটা নীচ প্রবৃত্তি আসিয়া যায়; তখন পতন অবশ্যম্ভাবী। আর একটি অন্তরায় আছে। লোকের নিকট বাহবা লইবার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা অত্যধিক আসে এবং সেই সঙ্গে অহংকারও প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয়, তাহাতেও লোকটির পতন হয়।

সূর্যের দিকে চাহিয়া জপ করা—একদিন বক্তৃতাকালে স্বামিজী বলিলেন, "ভারতবর্ষে একপ্রকার সাধু আছে, যাহারা সূর্যের উদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সূর্যের দিকে চাহিয়া জপ করে। তাহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে আমায় বলিয়াছিল যে, প্রথম প্রথম চোখ দিয়া জল পড়ে, চোখ জ্বলে যায়, সব অন্ধকার দেখে। কিন্তু কিছুদিন অভ্যাস করিলে, স্পষ্ট প্রদীপ্ত সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারা যায়। কিন্তু যাহারা এইরূপ প্রক্রিয়া করে, তাহাদের কোন অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবার উদ্দেশ্যে করে। ইহার দ্বারা মনের কোন উচ্চগতি বা ব্রহ্মদর্শন হয় বলিয়া আমার মনে হয় না।"

উর্ধবাহু—ভারতবর্ষে আর একপ্রকার সাধু আছে, যাহারা এক হাত বা দুই হাত উঁচু করিয়া রাখে। স্বামিজী বলিলেন, "তাহাদের সহিত কথা কহিয়া দেখিয়াছি যে, তাহারা হাতটা প্রথম কোন উচ্চ জিনিষ বা গাছের ডাল বা অন্য কোন জিনিষে বাঁধিয়া রাখে। প্রথম প্রথম অসহ্য যন্ত্রণা হয়, প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়, কিন্তু দিনকতক সহ্য করিবার পর যন্ত্রণাটা কমিয়া আসে এবং গ্রন্থীস্নায়ু সকল (muscles of the joint) মৃতবৎ হইয়া যায়, তারপর আর কোন অনুভূতি বা sensation থাকে না। এইরূপ করিবার কোন আবশ্যক নাই। এই সব হইতেছে সকাম সাধনার একটা প্রক্রিয়া।"

প্রাণায়াম—প্রাণায়াম বক্তৃতা আরম্ভ হইল। প্রাণায়াম হইতেছে নিজের প্রাণকে সংযত করা। অনেকের ধারণা শ্বাস-

প্রশ্বাসের ক্রিয়াকেই প্রাণায়াম বলে, বাস্তবিক তাহা নহে। ইহার সহিত প্রাণায়ামের সম্বন্ধ অতি অল্প। প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ, প্রাণের সংযম। সমুদয় জগৎ দুইটি পদার্থে নির্মিত, তাহার মধ্যে একটির নাম আকাশ। আকাশ মানে উপরে যে শূন্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নয়; এই উপরকার ভিতর যে বস্তু বা পদার্থ আছে, তাহাকে আকাশ বলে। যাহা সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহার নাম আকাশ নহে। যখন যোগীদের মন চিত্তাকাশে বা মন-আকাশে থাকে, তখন তাঁহারা অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ করেন বা অলৌকিক বস্তুসমূহ দর্শন করেন। কিন্তু মন পুনরায় যখন চিদাকাশে যায়, তখন অনুভূতি বিষয়শূন্য হয়; আত্মা নিজের স্বরূপে প্রকাশিত হয়। এই আকাশ একটি সর্বব্যাপী সত্ব। ইহা এত সূক্ষ্ম যে, ইহা সাধারণ অনুভূতির বাহিরে। যখন ইহা কোন আকারে পরিণত হয়, তখনই ইহা আমাদের ধারণায় আসে। সৃষ্টির আদিতে আকাশই থাকে এবং পুনরায় সমস্ত বস্তু আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়। এইস্থানে স্বামিজী অনেক দার্শনিক মত তুলিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। আকাশ আবার প্রাণের শক্তিতে জগৎরূপে পরিণত হয়।

যেমন আকাশ জগতের কারণীভূত সর্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রাণও তেমনি জগৎ উৎপত্তির সর্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সমস্তই আকাশরূপে পরিণত হয়; আর জগতের সমস্ত শক্তিগুলিই প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়। পুনরায় এই প্রাণ হইতেই সমুদায় শক্তির বিকাশ হয়। সমুদায় শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। এই প্রাণের প্রকৃত তত্ব জানা ও উহাকে সংযত করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইতে পারিলে অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া যায়।

রাজযোগের বিভিন্ন অংগ—রাজযোগের কয়েকটি বিভিন্ন অংগ আছে, সর্বশুদ্ধ তাহা আটটি। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,

প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যম ও নিয়ম হইতেছে—চরিত্র-গঠনের সাধন। চরিত্রগঠন ব্যতীত রাজযোগ সাধন অসম্ভব। কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। ব্রহ্মচর্য ব্যতীত রাজযোগ সাধন বিপদসঙ্কুল। তৃতীয়—আসন অর্থাৎ বসিবার প্রণালী। যোগ সাধনকালে শরীরের ভিতর নানারকম ক্রিয়া হইতে থাকিবে। স্নায়ুর ভিতর সাধারণতঃ যে সমস্ত শক্তি চলিতেছে, তাহাদিগের গতি ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে হইবে; তখন শরীরের ভিতর নূতন প্রকার কার্য আরম্ভ হইবে। সমুদয় শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে। ইহার অধিকাংশই মেরুদণ্ডের ভিতর হইবে। সেইজন্য যেরূপ আসন করিয়া বসিলে মেরুদণ্ড সহজভাবে অনেকক্ষণ থাকে, সেইভাবে আসন করিতে হইবে। কোমর, মেরুদণ্ড ও গ্রীবা যেন ঠিক সিধা থাকে, নচেৎ উচ্চ চিন্তা সম্ভবপর নয়। রাজযোগের এই অংশটি হঠযোগের সহিত মেলে। হঠযোগের উদ্দেশ্য কেবল দেহকে সবল ও সুস্থ রাখা। চতুর্থ—প্রাণায়াম। পঞ্চম—প্রত্যাহার অর্থাৎ মনকে অন্তর্মুখী করা। ষষ্ঠ—ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা। সপ্তম—ধ্যান ও অষ্টম—সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা।

প্রাণায়াম হইতেছে নিজের প্রাণকে সংযত করা। কি করিয়া প্রাণ জয় হইবে ইহাই হইতেছে প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশ্য। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ভিতর দিয়া প্রাণ প্রবাহিত হইলে প্রাণায়াম হয়। মনে থাকে যেন প্রাণ বলিলে ঠিক্ শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না, যে শক্তির বলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হয়, তাহাকে প্রাণ বলে। প্রাণায়াম, এই প্রাণের স্বরূপমূর্তি জানিবার ও বুঝিবার একটি প্রণালী। ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সমস্তই আবার প্রাণ শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাণ হইল একটি শক্তির নামস্বরূপ। যোগীদিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটি প্রাণ-প্রবাহ আছে। এই তিনটিকে তাঁহারা ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বলেন। তাঁহাদের মতে মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার

বামভাগে পিঙ্গলা ও দক্ষিণদিকে ঈড়া অবস্থিতি করিতেছে। আর ঐ দুইটির মধ্যস্থলে সুষুম্না রহিয়াছে। সুষুম্না অর্থ হইতেছে, যাহার ভিতর শূন্য। এই শূন্য নালীর নিম্নদেশে কুণ্ডলিনী অবস্থিত। যোগীরা উহাকে ত্রিকোণাকার বলেন। যখন এই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়, তখন ইহা সুষুম্নার ভিতর দিয়া বেগে উঠিবার চেষ্টা করে। যে সকল যোগীরা প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা অনেক অলৌকিক কার্য করিতে পারেন। প্রকৃতিতে সাধারণতঃ একরূপ কার্য চলিতেছে এবং সেই সাধারণ নিয়মেই বস্তু সকলের হ্রাস, বৃদ্ধি ও পরিবর্তন চলিতেছে। সাধারণ লোকের ধারণা ইহা অপরিবর্তনীয়, কিন্তু যোগীরা—যাঁহারা প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা এই সকল নিয়মের বহু উচ্চে মনকে লইয়া যাইতে পারেন এবং নূতন প্রকার বস্তুর যোজনা (combination) করিতে পারেন। অলৌকিক বা Miracle বলিয়া কোন জিনিষ নাই। যাহা একজনের নিকট অলৌকিক, অন্যের নিকট তাহা কিছুই নহে। অজ্ঞ লোকের নিকট প্রত্যেক জিনিষই অলৌকিক, কিন্তু সিদ্ধ যোগীদিগের নিকট এসব কিছুই নয়।

প্রাণায়াম তিনভাগে বিভক্ত যথা :—রেচক—বাহিরে শ্বাসত্যাগ, পূরক—শ্বাসগ্রহণ ও কুম্ভক—ভিতরে ধারণ করা। নিয়মিতভাবে প্রাণায়াম করিলে শরীর সুস্থ থাকে ও ব্যাধি অল্প হয়। মেরুদণ্ড সিধা করিয়া রাখিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে হয়। সমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া প্রাণায়ামের বিশেষ অংগ। শরীরস্থিত জীবনীশক্তিকে বশে আনয়নই হইতেছে প্রাণায়াম। প্রাণ শব্দ সচরাচর শ্বাস অর্থে অনুবাদিত হইয়া থাকে কিন্তু তাহা নহে। প্রাণ অর্থে জাগতিক সমুদয় শক্তি-সমষ্টি। উহা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই অবস্থিত। আমরা ফুস্‌ফুসের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ দেখিতে পাই। উহাতেই প্রাণের ক্রিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায়। সাধারণ লোকে এই ফুস্‌ফুসের গতিকে বন্ধ করিতে পারে না। এইজন্য আধুনিক

ইউরোপের মত, ইহা স্নায়ু ও ফুস্‌ফুসের স্বাভাবিক গতি (automatic action of the heart and the nerves)। কিন্তু যিনি যোগী তিনি মনে করিলেই এই ফুস্‌ফুসের গতি বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। ইহা কিছু আশ্চর্য নয়, যোগীর নিকট ইহা গুরুতর ব্যাপার নহে। যে পেশিশক্তি ফুস্‌ফুসের সঞ্চালন করিতেছে, তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। যখনই প্রাণ জয় হইবে, তখনই শরীরের মধ্যে অন্যান্য ক্রিয়া আয়ত্তাধীন হইবে। আমি এমন লোক দেখিয়াছি যে, যাঁহারা শরীরের সমস্ত পেশিগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালন করিতে পারেন। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা শ্বাস-প্রশ্বাস না লইয়া কয়েক মাস মাটির ভিতর বাস করিতে পারেন, তাহাতে তাহাদের দেহ নাশ হয় না। প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে সৃষ্টিশক্তির উপর যোগীর আয়ত্তের অধিকার হয়।

সমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস (rhythmical breathing) লইলে শরীর সুস্থ থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সিপাহীদের ফাঁকা জায়গায় দাঁড় করাইয়া মেরুদণ্ড সিধা করিয়া রাখা হয় এবং নিয়মিতভাবে পদ-বিক্ষেপ ও অন্যান্য প্রক্রিয়া করান হয়। এইজন্য সিপাহীরা সাধারণের অপেক্ষা সুস্থ ও সবলকায় হয়। যোগী ইচ্ছা করিলে দেহের ভিতর হইতে ব্যাধিকে বাহির করিয়া দিতে পারেন। আমি দেহের পীড়াবশতঃ পূর্বে গাড়ী গাড়ী (cart load) ঔষধ খাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। অবশেষে যখন মন হইতে পীড়াকে বাহির করিয়া দিলাম তখন হইতে শরীর বেশ সুস্থ আছে। যোগী ইচ্ছা করিলে স্পর্শ বা দৃষ্টির দ্বারা পীড়া উপশম করিতে পারেন, এমন কি দূর হইতেও উপশম করিতে পারেন। এইস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে স্বামিজী বর্তমান লেখকের দেড় বৎসরের ম্যালেরিয়া জ্বর ইচ্ছামাত্র দেহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। বর্তমান লেখক ও সারদানন্দ স্বামী চারতলার ঘরে ছিলেন এবং স্বামিজী একতলার ঘর হইতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া

তাহার পীড়া উপশম করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা সচরাচর যেভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করি তাহা বড় অনিয়মিত। আবার স্ত্রী-পুরুষের ভিতর শ্বাস-প্রশ্বাসের একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আছে। এইজন্যই আমাদের শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ সমভাবে (rhythmical) করা আবশ্যক কারণ তাহাতে শরীর সুস্থ থাকিবে। এইরূপ করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শরীর ক্রমশঃ যেন সাম্যভাব অবলম্বন করিতেছে ; তখন বুঝিতে পারিবে বিশ্রাম কাহাকে বলে।

প্রাণায়াম সাধনা করিতে হইলে প্রত্যহ অভ্যাস করিবে এবং ঐ অভ্যাস করিবার সময়—প্রাতঃকাল ও সায়াহ্ন। এই দুই সময় প্রকৃতি খুব শান্তভাব ধারণ করে। সর্বদা অভ্যাস প্রয়োজন। প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া নানারূপ কথা শুনিতে পারা যায় কিন্তু অভ্যাস না করিলে এক বিন্দুও উন্নতি করিতে পারা যায় না। সমুদয়ই সাধনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষ অনুভূতি না করিলে এ সকল তত্ত্ব কিছুই বুঝা যায় না। নিজে অনুভব করিতে হইবে, কেবল ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে কিছুই বোধগম্য হইবে না। যোগীদের শাস্ত্রে অনেক উচ্চ কথা লেখা আছে। যদিও আমি সবগুলি সাধন করি নাই কিন্তু যাহা করিয়াছি তাহাতে যোগীদের শাস্ত্রের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আমি তাহাদের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

প্রাণায়াম অল্পদিন সাধন করিলে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ, মধুর ও আকর্ষণী হইয়াছে। আমি এমন একটিও যোগী দেখি নাই যাহার কণ্ঠ স্বর কর্কশ। বয়স অধিক হইলে মুখে যে কুঞ্চিত চর্ম হয়, তাহা যুবার ন্যায় দৃঢ় হইয়া উঠে। মুখের উপর শুষ্কতা বা কঠোরতা প্রকাশক যে সকল রেখা পড়ে তাহা লোপ পায় ও বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মন তখন শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়। এই শান্তিভাব ও আনন্দ চোখ মুখ দেহ দিয়া স্পষ্ট ফুটিয়া বাহির হয়। কিছুকাল অভ্যাসের পর এইসব

চিহ্ন প্রকাশ পায়। কিন্তু মনে রাখা কর্তব্য যে সমস্তই সাধনার উপর নির্ভর করে। কণ্ঠস্বর মধুর, বার্দ্ধক্য স্থগিত ও বর্ণ উজ্জ্বল হয় শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের খুব আনন্দ হইল। তাহারা রাজযোগের অপর অংশগুলি লঘু মনে করিয়া প্রাণায়াম করিতে বিশেষ উৎসাহিত হইল, কারণ স্ত্রীলোকদিগের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম।

প্রত্যাহার ও ধারণা—প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার সাধনা করিতে হয়। প্রত্যাহার মানে মনের বহির্গতি রুদ্ধ করিয়া মনকে অন্তর্মুখী করা। মন সংযম করা বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার। শাস্ত্রে মনের সহিত উন্মত্ত বানরের তুলনা করা হইয়াছে। এই মন ও বানর লইয়া একটি বড় চমৎকার গল্প আছে। কোন স্থানে এক বানর ছিল, বানর স্বভাবতঃই মহাচঞ্চল। এক ব্যক্তি সেই চঞ্চল বানরটিকে একটু মদ খাওয়াইয়া দিল। তাহাতে সে অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিল; ঘটনাক্রমে তাহাকে আবার এক বৃশ্চিক দংশন করিল, তাহাতে সে তো গড়াগড়ি ডিগ্‌বাজী খাইতে লাগিল। তখন তাহার কি রকম অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ। দুর্ভাগ্যক্রমে এক ভূত আবার তাহার ভিতর প্রবেশ করিল, তখন সে তো লম্পঝম্প করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার অবস্থা বর্ণনাতীত। বানরের এই চাঞ্চল্যর সহিত শাস্ত্রে মনের অবস্থার তুলনা করা হইয়াছে। মানুষের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহার উপর নানারূপ আনুসঙ্গিক ব্যাপারে মানুষের মন বানরের মত চঞ্চল হইয়া উঠে। সেই বানর সদৃশ চঞ্চল মনকে স্থির ও অন্তর্মুখী করা সহজসাধ্য নহে। ইহাকে স্থির করাই প্রত্যাহার। প্রত্যাহার সাধনার পর ধারণা। ধারণা অর্থে মনকে কোন বিশেষ স্থানে ধারণ বা স্থাপন করা। মনকে শরীরের অন্যান্য স্থান হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া কোন এক বিশেষ স্থানে ধারণ করিয়া রাখা।

মন সংযম করা বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। নিজের মনকে যে

জয় করিতে পারে, সে অপরের মনকেও জয় (control) করিতে পারে। নিজের ভিতরকার সাহস বা দেবভাব অপরের ভিতর জাগ্রত করিয়া দিতে পারে। আমি অনেকের মন সংযত করিয়াছি এবং তাহাতে ফলও পাইয়াছি কিন্তু চিড়িয়াখানায় গিয়া হিংস্র সিংহ ও ব্যাঘ্রের মনকে সংযত করিবার কোন সুবিধা হয় নাই, সেইজন্য তাহা করিয়া কখন দেখাও হয় নাই। সিংহ ব্যাঘ্রের মনকে যে সংযত করিতে পারা যায় না এইরূপ অনাস্থা করিবার কোন কারণ নাই।

আত্ম-প্রতিভাত (Self Indentification)—স্বামিজী একদিন বক্তৃতাকালে বলিতে লাগিলেন যে, কোন বস্তুর ভিতর জানিতে হইলে, সেই বস্তুর সহিত মিশিয়া যাইতে হয় অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে হয়। তথায় যাইয়া স্থির হইয়া থাকিলে সেই বস্তুর ভিতরকার সব জিনিষ স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। একজন বৈজ্ঞানিক, যিনি একটি বস্তুর গুণাগুণ বাহির করিতেছেন, তাহা কি তিনি বাহির হইতে দেখিয়া ভিতরকার গুণাগুণ বলিতেছেন,—না অপর কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? বৈজ্ঞানিক ধ্যেয় বস্তুর উপর অনবরত চিন্তা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে আপনাকে বিদেহ করিয়াছেন। তখন বাড়ী, ঘর, দুয়ার, যন্ত্রপাতির আর জ্ঞান নাই, এমন কি তখন নিজের দেহেরও আর জ্ঞান নাই। তিনি তখন তাঁহার ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময় বা পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি নিজেই বস্তু হইয়াছেন। এইরূপভাবে কিছু সময় থাকিলে ধ্যেয় বস্তুর সমস্ত অলক্ষিত ও অপরিজ্ঞাত গুণ চিত্তাকাশে প্রতিবিম্বিত হয় এবং ভিতরকার নিভৃত গুণ সকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এখন টেলিস্কোপ ও নানা যন্ত্রপাতি হইয়াছে, সেইজন্য সূর্য চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহাদির নানা গুণ সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে কিন্তু বহু প্রাচীনকালে দূরবীন্ বা এরূপ কোন যন্ত্রাদি ছিল না। কিন্তু যোগীরা বহু প্রাচীনকালে আত্ম-প্রতিভাত বা self indentification

উপায় অবলম্বন করিয়া গ্রহাদির ভিতরকার অনেক তথ্য লিখিয়া গিয়াছেন এবং সেই সকল কথা এক্ষণে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। পূর্বে এই সকল যোগীদের বাক্যে অনেকেই বিদ্রূপ করিয়াছিলেন কিন্তু বিজ্ঞানের নূতন তত্ব আবিষ্কার হওয়াতে যোগীদিগের অনেক কথা এখন সমর্থিত হইতেছে। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, রাত্রে অনেক বকি, ব'কে ব'কে মাথা গরম হ'য়ে উঠে, দপ্ দপ্ করিতে থাকে, ঘুম হয় না। তখন মনে করি যে, যেন মস্ত এক চাপড়া বরফ মাথার উপর দিয়ে শুয়ে আছি। এইরূপ মনের ভাব পরিবর্তন হইলে মাথাটা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, যন্ত্রণা কমে এবং বেশ ঘুম হয়। মনকে দেহ হইতে বাহির করিয়া অপর বস্তুর সহিত মিশাইতে হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুর গুণ বর্তায়।

স্থূল শরীর ত্যাগ এবং সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর ধারণ (Transfiguration)—স্থূল-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর ও কারণ শরীরের বিষয় বক্তৃতা হইতে লাগিল। নানাপ্রকার তর্কযুক্তি দিয়া ভাবগুলি বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার পর স্বামিজী বলিলেন যে, সিদ্ধ যোগীরা ইচ্ছা করিলে স্থূল-শরীর ত্যাগ করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম-শরীর ও কারণ-শরীরে যাইয়া আবার অন্যত্র স্থূল-শরীর ধারণ করিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিলেন যে, যীশুর দেহাবসানের পর তাঁহার শিষ্যরা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, এই কথা বাইবেলে লেখা আছে। এটা কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল ? স্থূল-শরীর মাত্র বিনাশ হয় কিন্তু সূক্ষ্ম-শরীরে বা কারণ-শরীরে সেই স্থূল দেহটা পরমাণুরূপে থাকে। স্থূল-শরীরটা হইতেছে পরমাণুসমষ্টি মাত্র। সিদ্ধ যোগী ইচ্ছা করিলে কারণ-শরীর হইতে নামিয়া আসিয়া সূক্ষ্ম-শরীর ও স্থূল-শরীরের পরমাণুকে জমাট করিয়া লইয়া পুনরায় স্থূল-শরীর ধারণ করিতে পারেন। অনবরত ধ্যেয় বস্তু চিন্তা করিতে করিতে যোগীর মন তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া যায়। তখন স্থূল-শরীরের সমস্ত পরমাণু উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে এবং ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। তাহার

পর ধ্যেয় বস্তুর পরমাণু ধ্যানীর শরীরের পরমাণুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। তখন ধ্যানী ও ধ্যেয় বস্তু একই হইয়া যায়। এই জন্য যীশুর transfigurationএর সময়ে যে জ্যোতিমূর্তি হইয়াছিল, তাহা কিছু আশ্চর্য নয়। আর একটি উদাহরণ তিনি বলিলেন, একবার শঙ্করাচার্য কতিপয় শিষ্য লইয়া একস্থানে যাইতেছিলেন। যাওয়া একটু শীঘ্র আবশ্যক, পথের মধ্যে একটা পাহাড় আছে, সেইটাকে ঘুরিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে অনেক দেরী হইবে। আচার্য শঙ্কর শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাহাড় ঘুরিয়া যাইবে না পাহাড় ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে?" শিষ্যরা একথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না, সেইজন্য পাহাড় ঘুরিয়া যাইতে মনস্থ করিল। আচার্য শঙ্করও শিষ্যদিগকে 'তদ্রূপ করিতে বলিলেন এবং নিজে স্থূল-শরীরকে বিশ্লেষণ করিয়া সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরে পরিণত করিলেন। তখন তিনি কারণ-শরীরে পাহাড়ের ভিতর দিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া পুনরায় স্থূল শরীর ধারণ করিলেন। এদিকে শিষ্যরা পাহাড় ঘুরিয়া আসিয়া দেখে যে আচার্য শঙ্কর তাহাদের অনেক পূর্বেই আসিয়াছেন এবং তখন সকলেই আশ্চর্য হইয়া আচার্যকে নানা বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিল।

অধ্যাস্—অধ্যাস্ বা super-imposition বক্তৃতা হইতে লাগিল। স্বামিজী সে রাত্রে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, মুখ উজ্জ্বল, মনুষ্যভাব পরিত্যাগ করিয়া যেন কোন উচ্চাবস্থার ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন। কণ্ঠস্বর আজ্ঞাপ্রদ, শব্দায়মান; পূর্বভাব সমস্ত তিরোহিত হইয়া এক মহাশক্তিমান্ পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। জগতের আবহমানকাল ধর্ম-বিশ্বাস একদিকে আর তিনি যেন আর একদিকে দাঁড়াইয়া সব ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব একেবারে উদ্ঘাটিত করিতে লাগিলেন। খাতির বা পক্ষপাতিত্ব কোন বিষয়েই নাই। A dry philosopher and a divine being অর্থাৎ নিরপেক্ষ জ্ঞানীপুরুষ ও প্রত্যক্ষ দেবতা—দুই একসঙ্গে হইলেন।

অধ্যাসের বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি বলিলেন যে, কিছুদিন সাধনা করিলে বা জপ ধ্যান করিলে বা প্রাণায়াম করিলে মন যখন স্থুল-দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহের দিকে যায়, তখন ওজস্ বা কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হয়। কুণ্ডলিনীশক্তি কিভাবে জাগ্রত হয় তাহা প্রথমে বুঝা যায় না। মনের বৃত্তি হইতেছে বহির্মুখী। মন যদিও তখন অন্তর্মুখী হইতে থাকে, কিন্তু তখন সেই অন্তর্মুখী ভাবটা বহির্মুখী ভাব দিয়া প্রকাশিত হয়। মন তখন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেখানে দ্বন্দ্ব বা দুইটি ভাব আর থাকে না; সমস্তই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা। কিন্তু এখান হইতে মন নামিলে চিত্তাকাশ বা মনো-আকাশ হয় অর্থাৎ নির্গুণ হইতে স্বগুণে আসে। এই চিত্তাকাশে কুণ্ডলিনী ও ওজসের অন্তর্মুখী বৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয়। ইহাকে অধ্যাস বা super-imposition বলে।

সকল ধর্মশাস্ত্রের ভিতর এবং সকল মহাপুরুষদের জীবনীতে দেব-দর্শন বা অশরীরী-বাণীর বিষয় লেখা আছে এবং এক ব্যক্তির দেব-দর্শন ও অশরীরী-বাণীর সহিত অপর ব্যক্তির মিল নাই, অথচ প্রত্যেকেই সিদ্ধ মহাপুরুষ ও জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই বলিতেছেন "আমি এই সত্য দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি, তাহাই লোককে বলিতেছি।" ইহাকে অনুভূতি (inspiration) বা উদ্ঘাটন বলে। সত্য যেন তাঁহাদের কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পাইল, অথচ মহাপুরুষদের ভিতর পরস্পর এবিষয়ে সামঞ্জস্য নাই। রাজযোগই একমাত্র শাস্ত্র যাহা সকলের অসামঞ্জস্য ভাবকে সামঞ্জস্যে পরিণত করিতে পারে।

ওজস্ বা কুণ্ডলিনী যখন যে পদ্মে বা কেন্দ্রে উঠিয়া থাকে, সাধক সেই পদ্ম বা কেন্দ্রানুযায়ী চিত্তাকাশে অধ্যাস দর্শন করে। জংলী অসভ্য জাতীয় নরমাংস আহারী ব্যক্তি দেখে যে, ভীষণ এক দেবতা আজ্ঞাপ্রদ মূর্তিতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন এবং দ্রষ্টার প্রবৃত্তি অনুযায়ী বীভৎস প্রক্রিয়া করিতে আদেশ করিতেছেন, হয়

নরমাংস আহার করিতে বা অন্য কোন প্রকার তদনুরূপ বীভৎস ও লোমহর্ষণ কার্য করিতে আদেশ করিতেছেন। কিন্তু অন্যদেশে যেখানে শান্তিভাব আছে, সেখানকার সাধকের কুণ্ডলিনী আর এক কেন্দ্রে বা পদ্মে উঠিলে অন্যরকম অধ্যাস হইবে। কেহ বা শান্তিপূর্ণ মূর্তি দেখিতেছে, কেহ বা দয়াপূর্ণ মূর্তি দেখিতেছে ইত্যাদি। এই স্থানের সাধকদের প্রাকৃতিক আনুকূল্য (natural surroundings) বা জলবায়ুর অবস্থা অনুযায়ী (climatic effect) অধ্যাস ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ান্সদের অধ্যাস এক প্রকার, আর নরওয়ে সুইডেন দেশের আদিম অধিবাসীদের অধ্যাস অন্য প্রকার। রেড্ ইণ্ডিয়ান্সদের বড় মাঠ হইবে, হরিণ শিকার করিয়া বেড়াইবে, আর নরওয়ে সুইডেনদের আদিম অধিবাসীরা বরফের দেশের লোক, তাহাদের একটী বড় বাড়ী হইবে এবং তথায় বসিয়া খুব করিয়া মদ্য পান করিবে।

স্বর্গের বর্ণনা দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির কোন্‌টি অভাব আর কোন্‌টি তাহাদের বাঞ্ছনীয় বস্তু, বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর রাজদরবারে যে সকল জিনিষ হয় অর্থাৎ রাজকর্মচারীরা যে সকল রাজোচিত আহারাদি ও নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদ ভোগ করে, সাধারণ লোকে তাহা ভোগ করিতে পারে না। তাহাদের ইচ্ছা হয় যে মৃত্যুর পর পরলোকে যাইয়া এই সমস্ত বস্তু ভোগ করিবে। স্বর্গটি হইতেছে—মেঘের উপর কোন একটা স্থান, সেখানে সোনার বাড়ী, তাহাতে খুব হীরা চুণী প্রভৃতি জহরত লাগান আছে, খাওয়া দাওয়া প্রচুর ইত্যাদি। সকল ধর্মের ভিতর এই ভাবটা অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জাতির ভিতর কোন্ বস্তুর অভাব এবং তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তি কোথায় যাইতেছে, তাহাও পক্ষান্তরে বুঝা যায়। ইহাকেই বলে অধ্যাস। কারণ স্বাভাবিক মানুষের একটি অভাব বৃত্তি রহিয়াছে, যাহা এক সময় না এক সময়

পূর্ণ করিতে হইবে। বৃত্তির অর্থ বর্তুলাকারে আপন কেন্দ্রে পুনরায় ফিরিয়া যাইবে।

হজরত মহম্মদের অধ্যাস—হজরত মহম্মদ দেখিতেন যে, দেবদূত সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেক কথা বলিয়া যাইতেছেন এবং তিনি তাহাই শুনিতেছেন। পরে সেই সকল বিষয় তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে বলিতেন। হজরত মহম্মদ যে স্পষ্ট দেবদূত দেখিয়াছিলেন এবং তাহা সরলভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সে বিষয় সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তাঁহার অধ্যাস অনুযায়ী সত্য দর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সকল অশরীরী বাণীর ভিতর যে অনেক উচ্চ সত্য আছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এইটী হজরত মহম্মদের অধ্যাস অনুযায়ী হইয়াছিল। এইজন্য স্থান অনুকূল ও প্রতিকূল অনুযায়ী অধ্যাসের দৃষ্ট বস্তু আপনার অভাব বা আবশ্যক অনুযায়ী ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

বক্তৃতাকালে স্বামিজী প্রথমে নিজে দেড় ঘণ্টাকাল অনবরত বলিয়া যাইতেন। তাহার পর বক্তৃতা শেষ হইলে, সাধারণকে পুনরায় প্রশ্ন করিবার সুযোগ দিতেন। তখন তিনি বিশেষ আদবকেতা বা সংযতভাব রাখিতেন না, সাধারণভাবে উত্তর দিতেন। যদি কাহারও সেদিনকার বক্তৃতার বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকিত—তিনি স্বামিজীকে সেইভাবে প্রশ্ন করিতেন এবং স্বামিজীও মধুর ভাষায় সেই বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেন। কখনও বা সেই ব্যক্তির কাছে আসিয়া কথাগুলি চারপাঁচ জন লোকের ভিতর বেশ ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতেন। তখন তাঁহার বক্তৃতাকালের গম্ভীর ভাবটা থাকিত না, এমন কি যাহারা বিশেষ পরিচিত থাকিত, তাহাদের স্বাস্থ্য বা অন্যান্য বিষয়ও একটু আধটু বলিতেন। কিন্তু এক একদিন বক্তৃতার অপেক্ষা প্রশ্নোত্তর সময়ে অনেক বড় বড় কথা বাহির হইয়া যাইত। বক্তৃতায় যেমন তর্কযুক্তি দিয়া কথা হইত, ইহা তাহা নয়। নিজের সাধনার কথা বলিতেন ও তৎপ্রসঙ্গে অনেক নূতন গভীর

ভাবের কথা হইত। স্বামিজী অনেক সময় বলিতেন, "আমি যাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া এই সকল শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাঁহার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) এই সকল হইতে দেখিয়াছি এবং তাঁহার নিকট এই সকল বিষয় শুনিয়াছি। তাঁহার ন্যায় উচ্চ অধিকারী আমি নহি।" অতি অল্প বিনীত ভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার যে অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তাহাই তিনি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই বেশ স্পষ্ট বুঝিতেন এবং অনুভব করিতে পারিতেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ যদি এত উচ্চাবস্থার মহাপুরুষ হন, তাহা হ'লে তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব না জানি কত উচ্চাবস্থার সাধক হইবেন! আমেরিকায় ও লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, স্বতন্ত্র ভাব ছিল, সে মহাশক্তি ভারতবর্ষ দেখে নাই। ভারতবর্ষ নরেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখিয়াছিল, আর পাশ্চাত্য জগৎ মহাশক্তিমান স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিল। হয়তো ভারতবর্ষ সে শক্তি সহ্য করিতে পারিত না, তাই স্বামিজী সেই শক্তির বিকাশ ভারতবর্ষে দেখান নাই। জগৎ-বিজয়ী ইংরাজ জাতির শক্তির উপর নিজের শক্তি কিরূপে স্থাপন করিতে হয়, তাহাই তথায় দেখাইয়াছিলেন। বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইত যে, ইংরাজদিগের শ্রেষ্ঠতম লোক, কি ধনী, কি মানী, কি পণ্ডিত ইহাদের মাথাগুলি লইয়া ভাঁটা লুপিতেন, ভ্রুক্ষেপ বা গ্রাহ্যের ভিতর কাহাকেও আনিতেন না। সকলেই যেন অনুগত ভক্তের ন্যায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। এই শক্তি তিনি পাশ্চাত্য জগতে দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু যখন ফিরিলেন, তখন সে শক্তিকে নিরঞ্জন দিয়া পুনরায় নরেন দত্ত হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাস—স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "আমি যে মহাপুরুষের পদপ্রান্তে বসিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলাম, তিনি ব্রহ্মময়ী মাকে (Divine Mother) দর্শন করিতেন। তিনি দেখিতেন যে, ব্রহ্মময়ী মা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমস্ত সত্য

বলিয়া যাইতেছেন। সেই সকল সত্য অতি উচ্চভাবের এবং গভীর অর্থ-পরিচায়ক। কি করিয়া এই মহাপুরুষ ব্রহ্মময়ী মাকে দর্শন করিতেন? তাঁহার ওজস্ উচ্চাবস্থায় উঠিলে তিনি অধ্যাসে মাতৃরূপ দর্শন করিতেন এবং সেই ব্রহ্মময়ী মা নানারূপ কথা কহিতেন ও এই মহাপুরুষ তাহাই শ্রবণ করিতেন। নূতন নূতন ভাবের কথা ও নূতন নূতন সত্য তিনি শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছিলেন। বাহ্যিক পাঠে বা অধ্যয়নে এইস্থলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না, শুধু ওজস্‌কে জাগ্রত করাই একমাত্র উপায়। এইজন্য এই মহাপুরুষ নিরক্ষর হইয়াও ভাব-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহাকেই বলে অধ্যাস।"

বুদ্ধদেবের অধ্যাস—বুদ্ধদেবের অধ্যাস সম্বন্ধে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "আমি এই সকল সত্য দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি, তাহাই আমি নির্ভীক হইয়া লোক সকলকে বলিতেছি। যদি জগতের সমস্ত ভাব আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় তাহাতে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না। আমি সত্য দেখিয়াছি, এই সকল সত্য চিরকাল থাকিবে। আমি যে সকল সত্য বলিতেছি, এই সকল সত্য বেদস্বরূপ হইবে।" বুদ্ধদেব যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা সকলই মহাসত্য। কিন্তু তিনি তাহার অধ্যাস অনুযায়ী যাহা দর্শন করিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছিলেন।

বৈদিক ঋষিদিগের অধ্যাস—বৈদিক ঋষিরাও কঠোর তপস্যা করিয়া ওজস্ বা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছিলেন। তাঁহারাও অনেক সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক সত্যই ঠিক, তবে প্রত্যেক ঋষি নিজের অধ্যাস অনুযায়ী সত্য দর্শন করিয়াছিলেন বা অশরীরী-বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন; তাহাই তাঁহারা নির্ভীক হইয়া তাঁহাদের সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উপাখ্যানে আছে যে এক ঋষি স্রোতস্বিনী নদী হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। নদী কখন কথা কহিতে পারে না; নদী হইতেছে জল-প্রবাহ। তবে

কিরূপে তিনি নদী হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন? মন যখন উচ্চাবস্থায় গমন করিল, তখন সেই ঋষি যেন নদী হইতে, বহির্জগৎ হইতে ব্রহ্মবাণী শুনিতে পাইলেন। ইহাকে reflexive mind বলে।

অগ্নি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ—একটি উপাখ্যানে আছে যে এক ঋষি অগ্নি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। অগ্নি—অগ্নি, তাহাতে কোন বিশেষত্ব নাই, কিন্তু কেমন করিয়া অগ্নি ব্রহ্মজ্ঞান দান করিল? এক ঋষি বসিয়া হোম করিতেছিলেন। হোম করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত খুব সংযত হইয়া গেল, ঋষির মন বা ওজস্ উচ্চাবস্থায় যাইলে তিনি যেন অগ্নি হইতে বেদবাণী শুনিতে পাইলেন। তিনি যেন হোমাগ্নি হইতে বেদবাণী উঠিতে দেখিলেন। এইজন্য অগ্নিকে জাতবেদ বলে। তাঁহার অধ্যাস্ অনুযায়ী তিনি এই সত্যই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে অধ্যাস বা supper-imposition (transference of thought) বলে।

গাভী মুখ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ—একটি ঋষির উপাখ্যানে আছে যে, তিনি মাঠে ধেনু চরাইতে চরাইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মাঠে গাভী বা ধেনু চরাইতেন ও সর্বদা জপ করিতেন। বহুদিন এইভাবে অতিবাহিত করিলেন, অবশেষে তাঁহার তপস্যার পূর্ণসীমা বা পূর্ণাবস্থা উপনীত হইল। একদিন তিনি ধেনু লইয়া চরাইতে চরাইতে গভীর বনে প্রবেশ করিয়াছেন ও নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গাভী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে লাগিল এবং এই সকল ব্রহ্মবাণী মহাসত্য। গাভী কখন মনুষ্যোচিত ব্রহ্মবাণী বলিতে পারে না। কিন্তু ঋষির শ্রুত গাভীমুখবিনিঃসৃত ব্রহ্মবাণী পরম সত্য। এই সকল কেমন করিয়া হইয়াছিল। ঋষি আপনার অধ্যাস গাভীতে দর্শন করিয়াছিলেন। বৈদিককালে এরূপভাবে ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বা ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এইরূপ উপ্যাখ্যান যথেষ্ট আছে এবং সেই সমস্ত মহাসত্য এখনও অটুট রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ঋষির

উপাখ্যানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। রাজযোগ একমাত্র উপায় যাহাতে বিভিন্ন ভাবসমূহ সামঞ্জস্য অবস্থায় আনা যাইতে পারে এবং দ্রষ্টার মানসিক বৃত্তির তারতম্য অনুযায়ী অধ্যাস বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

মোজেসের অধ্যাস্—মোজেসের (Moses) কথা উঠিল। মোজেস জ্বলন্ত গুল্ম বা burning bush দর্শন করিয়াছিলেন এবং অভীষ্ট সত্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। গুল্ম কথা কহিতে পারে না, কিন্তু মোজেসের দর্শন বা শ্রবণ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। বিজ্ঞান অনেক সময়ে এইসব ঘটনাকে মস্তিকের বিকৃত অবস্থা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু দার্শনিকের কোন বিষয় বিদ্রূপ করিবার উপায় নাই বা নিয়ম নাই। প্রত্যেক বস্তুর ভিতর কিরূপ সত্য আছে তাহা নির্ণয় দর্শনশাস্ত্রের কাজ। বিজ্ঞান যাহাকে মস্তিষ্কবিকৃতি বলিতেছে, রাজযোগ তাহাকেই অধ্যাস বা super-imposition বলিয়া ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিতেছে।

সত্যের আবিষ্কার—অনেকেই বলিয়া থাকেন যে অমুক ব্যক্তি সত্য আবিষ্কার করিল। সত্য কি একটা ঘরের কোণে বসিয়াছিল বা অপেক্ষা করিতেছিল যে, কখন সেই ব্যক্তিটি আসিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। যদিও সত্য অনেক প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বহু সত্য এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। যত সত্য প্রকাশ হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে এখনও বাহির হইতে আছে। যদি কেহ বলেন যে আমি পূর্ণমাত্রায় সত্য বাহির করিয়াছি তাহলে তাহার কথা সম্পূর্ণ ভুল। সত্য অনন্ত, ইহার কোন সীমা থাকিতে পারে না। প্রত্যক নূতন ব্যক্তি নূতন যুগে নিজের অধ্যাস অনুযায়ী নূতন সত্য প্রকাশ করিতেছেন। জগতে যতদিন মনুষ্য থাকিবে, ততদিন নূতন নূতন সত্য উদ্ঘাটিত হইবে। সত্য কাহারও একচেটিয়া (monopoly) সম্পত্তি নয়। মূর্খ, গোঁড়া ব্যক্তিরাই শুধু বলিয়া থাকে যে তাহারা পূর্ণ সত্য বাহির করিয়াছে। এইসব লোকেরাই

জগতের মহা অনিষ্টকর। সত্য অনন্ত, অনন্তকাল ধরিয়া তাহার আবিষ্কার করিতে হইবে।

পিশাচ সিদ্ধির কথা—মাদ্রাজের পিশাচ-সিদ্ধির কথা উঠিল। পিশাচ-সিদ্ধির কথা অন্য পুস্তকে (ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড) বলা হইয়াছে বলিয়া শুধু এইস্থলে আবশ্যকীয় অংশ বলা যাইতেছে। পিশাচ-সিদ্ধ বাল্যকালে কোন এক সিদ্ধপুরুষের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল। সিদ্ধপুরুষ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে উচ্চাঙ্গের কয়েকটি উপায় শিখাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রীতিমত প্রথানুযায়ী প্রক্রিয়া সকল না হওয়ায়, অন্য সকল অংশ তাহার কিছুই হয় নাই। জীবন ও আচরণ অতি কদর্য হইয়াছিল। শ্মশানে একটা স্ত্রীলোক লইয়া থাকে, মড়া জ্বালান কাঠে রাঁধিয়া খায় এবং অনবরত মদ খাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার অধ্যাস ক্রিয়াটা হইয়াছিল। সে দেখিত—এক দেবী সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিয়া যাইতেছেন এবং সে কাগজে কথা অনুযায়ী অনন্ত বাণী লিখিয়া লইতেছে। অধিকাংশ স্থলে তাহার লিখিত কথাগুলি ঠিক হইত। কিন্তু উচ্চাবস্থার সত্য সে কিছু বলিতে পারিত না ; মোটামুটি 'দূরাৎ শ্রবণম্' 'দূরাৎ দর্শনম্' হইয়াছিল। কখন কখন তাহার অভীষ্টমূর্তি সম্মুখে আসিত না, তখন সে মনকে সংযত করিবার জন্য একখানা শ্লেটে পেন্সিল দিয়া লিখিতে আরম্ভ করিত। কখনও বা খানিকটা ঐরূপে লিখিলে মনটা সংযত হইত এবং তাহার অভীষ্টমূর্তি সম্মুখে আসিয়া প্রশ্ন সকলের উত্তর দিত। তাহার অধ্যাস হইয়াছিল, কিছু স্থূল স্নায়ু বা নিম্নস্থ পদ্ম হইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার কথিত বস্তু সকল অপর প্রকার হইয়াছিল। এইজন্য তাহার আচরণ ও জীবনের কার্য সকল অতি কদর্য হইয়াছিল।

স্বামিজীর নিজের অধ্যাস—স্বামিজী যে সকল উচ্চভাব বা সত্য বলিয়াছিলেন, সেই সকল সত্য তিনি সুষুপ্ত বা অধ্যাস অবস্থাতেই বলিয়াছিলেন। অনেক সময়ে তিনি বলিতেন, "আমি

কিছুমাত্র জানি না, কিছুমাত্র ভাবি না, বক্তৃতার জন্য আমি নোট রাখি না এবং বক্তৃতায় কি বলিতে হইবে, তাহাও আমি পূর্বে ভাবি না। উপস্থিত মত কয়েক মিনিটকাল মনটা সংযত বা সাম্যাবস্থায় লইয়া যাই এবং তখন দেখি ভাব সকল স্পষ্টরূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। আমি সেই সকল জীবন্ত ভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়া বড়্ বড়্ করিয়া বলিয়া যাই। কি বলি কিছুই বুঝিতে পারি না। যতক্ষণ সেই সকল ভাব মূর্তিমান হইয়া সম্মুখে না দাঁড়ায় ততক্ষণ আমি কোন কথা কহিতে পারি না, যখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, তখনই কথা আরম্ভ করি।" বর্তমান লেখক অনেক সময় বক্তৃতাকালে স্বামিজীর এই রূপান্তর ভাব পরিলক্ষণ করিয়াছিলেন এবং অনেক সময় স্বামিজীকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে, মানুষের যেমন রূপ, অবয়ব (form and colour) আছে, ভাবগুলিরও সেইরূপ রূপ ও অবয়ব আছে।

এই অধ্যাসের বক্তৃতা কয়েকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইস্থলে দেওয়া হইল। বোধ হয় স্বামিজীর বক্তৃতার ভিতর ইহা এক অতি গভীর উচ্চাঙ্গের ভাবপূর্ণ বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর সকলেই স্তম্ভিত এবং নূতন সত্য শুনিতে লাগিলেন। ধর্ম ও মত বিষয়ে কত বিভিন্ন মত আছে, সত্য উদ্ঘাটন (revelation), অনুপ্রেরণা (inspiration) লোকের হইলেও সকলের এক প্রকার নয়, তারও তারতম্য ও বিভিন্নতা আছে এবং সকল সত্য উদ্ঘাটন ও অনুপ্রেরণাকে এক সামঞ্জস্য সূত্রে গ্রথিত করিতে পারা যায়, এই তথ্যটি শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া রহিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের বাহিরে আমেরিকায় ও পাশ্চাত্য জগতে এই মহাসত্য প্রথমবার প্রচারিত হইল। পুরাকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই সত্য ভারতের বাহিরে কিরূপভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক খবর কাহারও বিশেষ জানা নাই, তাহার কোন হিসাবও নাই, কিন্তু এযুগে স্বামিজী এই মহাসত্য

এবং সকল ভাবের ভিতর সামঞ্জস্যভাব ইদানীন্তনকালে প্রথম প্রচার করিলেন। সেই সময় তাঁহার মুখের ভাব, চক্ষের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর কিরূপ তেজঃপূর্ণ ও প্রদীপ্ত হইয়াছিল তাহা অনুমান করিতে হয়, ভাষায় ঠিক বলা যায় না। তিনি যে মহাশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মমণ্ডলীর ভিতর তিনি যে নির্ভীকভাবে দাঁড়াইলেন, পক্ষান্তরে সেইটাও প্রকাশ পাইতে লাগিল। অপর সকল মহাপুরুষের কাছে তিনি যোড়করে প্রার্থীরূপে দাঁড়ান নাই, সকলের যথাযথ সম্মান রাখিয়া সমশ্রেণীর ও সমকক্ষ লোক বলিয়া নিজের শক্তির প্রকাশ দেখাইতে লাগিলেন। এইজন্য বক্তৃতাটি অতি উচ্চাবস্থার হইয়াছিল। এই বক্তৃতা চারি দিন অর্থাৎ আটবার হইয়াছিল।

জনৈক ইংরাজের সহিত কলহ—অধ্যাসের বক্তৃতাটি অতি উচ্চ প্রকার হওয়ায় সাধারণের ভিতর স্বামিজীর খুব নাম প্রচার হইল এবং অনেক নূতন নূতন ব্যক্তি বক্তৃতা শুনিতে আসিলেন। ঐ অধ্যাসের বক্তৃতাটি খুব গভীর ও তেজঃপূর্ণ হইয়াছিল। একজন পেন্সন্-প্রাপ্ত বাঙ্গালাদেশের ইংরাজ কর্ম্মচারী সন্ধ্যাকালে বক্তৃতা শুনিতে আসিলেন। লোকটির বয়স হইয়াছিল; কৃশ এবং কিছুদিন গরম দেশে থাকায় সাধারণ ইংরাজ অপেক্ষা তাহার গায়ের রং কিছু মলিন হইয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। স্বামিজী আপন স্থানটিতে দাঁড়াইলেন। Goodwin টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া লিখিবার উপক্রম করিল। সারদানন্দ স্বামী, Sturdy, Fox ও বর্তমান লেখক চারিজনে ঘরের অপর প্রান্তে কোণের কাছে সোফায় বসিয়াছিলেন। স্বামিজী ধীরে ধীরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। দুই পাঁচ মিনিট বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় ভারত প্রত্যাগত ইংরাজটি অতি অবজ্ঞাসূচক বিকৃতস্বরে উচ্চ আওয়াজ করিয়া বলিল, "Oh, thank you!" এইরূপ অবজ্ঞাসূচক শব্দ শুনিয়া সকলেই সেই:

ইংরাজটির দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু তখন কেহ কিছু বলিল না। স্বামিজী কোন কথাই লক্ষ্য না করিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। লোকটি দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এইরূপ বিকৃতস্বরে "Oh, thank you!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলেই একটু বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আতসিখানার নিকট বসা লোকটির দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু তখনও কেহ কোন বাহ্যিক ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিল না। কারণ অধ্যাসের বক্তৃতার পর হইতে অনেকেই স্বামিজীকে যীশু বা পল এইরূপ মহাপুরুষের শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়াছিল এবং একান্তমনে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছিল। সাদা কথায় সিদ্ধগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু স্বামিজীর প্রতি সেই লোকটি এরূপ রূঢ়ভাবে কথা কওয়ায় সকলেই একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং শ্রোতারা এদিক ওদিক ঘাড় ফিরাইয়া লোকটির প্রতি বারে বারে দৃষ্টি করায়, তাহাদের মনোগত ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। স্বামিজী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন যে, খৃষ্টীয়ধর্মটা এখন সাংগ্রামিক ধর্ম হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ভিতর এখনও খুব দয়ার ভাব আছে। এখন এই বৌদ্ধধর্মের জন্য চীন দেশে চল্লিশ কোটী (Four hundred millions) লোক একমুঠো অন্ন পাইতেছে। যে সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম এখনও প্রবল আছে, সেখানে যুদ্ধ ও বিজ্ঞান দিয়া নরহত্যা অনেক পরিমাণে কম। কিন্তু যেখানে খ্রীষ্টান ধর্ম চলিতেছে, সেখানে বহু সংখ্যক লোকের অন্ন জুটিতেছে না এবং তারা সদাসর্বদা রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। যীশু নিজে খুব দয়াবান লোক ছিলেন, আধুনিক খৃষ্টধর্মটি সাংগ্রামিক ধর্মে পরিণত হইয়াছে। সেই লোকটি আতসিখানার কাছ হইতে বসিয়া বলিয়া উঠিল, "Sir Monier Williamsএর পুস্তকে লিখিয়াছে যে বুদ্ধ অতি স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর লোক ছিল, নিজের স্ত্রী পুত্রকে ত্যাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সে নাস্তিক ছিল, ঈশ্বর মানিত না। তাহার ধর্মকে ধর্মের ভিতর গণ্য করা

যাইতে পারে না। বুদ্ধ কেবল কতকগুলি সামাজিক নীতি প্রণয়ন করিয়াছিল, নাস্তিকের কোন ধর্ম ই হয় না। আর যীশুর ধর্ম ই একমাত্র ধর্ম, ইহাতেই ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস এবং কল্যাণকর অনেক কথা আছে।" লোকটি বোধ হয় Sir Monier Williamsএর পুস্তকখানি পড়িয়াছিল এবং ভারতবর্ষে অবস্থানকালে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত কোন পুস্তক পাঠ করে নাই, তাই বারে বারে Sir Monier Williamsএর কথা তুলিতে লাগিল। স্বামিজী তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া, বুদ্ধদেবের দয়ার বিষয় অনেক বলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, অদ্যাপিও ভারতবর্ষে এইরূপ উচ্চাবস্থার সাধু আছে। এই সমস্ত কথা শুনিয়া লোকটি বলিয়া উঠিল, "না, 'আমি জানি সাধুরা চোর, সব চোর। সাধুরা যখন কোন নগরে বা গ্রামে যাইত, তখন আমি তাহাদের পিছনে পুলিশ লাগিয়ে দিতুম; এমন কি অনেক সময় পুলিশ দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতুম। চোর ছ্যাঁচড় লোকেরাই গেরুয়া পরে, আর তাহাদেরই সাধু বলে।" Sturdy পিছনের সোফায় বসিয়াছিল, ত্বরিতপদে ঘরের মাঝখানে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "আমি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে অনেক উচ্চাবস্থার সাধু দর্শন করিয়াছি, তাহারা অনেকেই স্বামিজীর মত এত উচ্চ অবস্থার লোক। আমি এই বিষয় বিশেষ করিয়া জানি এবং তাঁহাদের সাথে কথাবার্তা কহিয়াছি এবং তাঁহাদের দর্শন করিয়াছি"। Sturdy উচ্চরবে এবং কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া এই কথাগুলি বলিল।

পূর্বে সেই ইংরাজটি মনে করিয়াছিল যে, স্বামী বিবেকানন্দ কোন মাদ্রাজী হইবে, কারণ পূর্বে অর্শচিকিৎসার জন্য অনেক মাদ্রাজী কলিকাতার বৌ-বাজারে বাস করিত এবং তাহাদের লম্বা মাদ্রাজী নামের পূর্বে 'স্বামী' কথাটি থাকিত। কিন্তু যখন সে কথাবার্তা, ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করিল, তখন সে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিল। তখন তাহার বুকখানা দশ হাত ফুলিয়া উঠিল এবং সে মাতব্বরি চালে অতি বিকৃত-

স্বরে বলিয়া উঠিল, "I thought you were a Madrasi, now I see you are a Bengali Babu. You know that during the Mutiny we saved you." Sturdy সুখাসনে বসিয়াছিল, ক্ষিপ্তের ন্যায় দৌড়াইয়া গিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া বলিল, "But you were well paid for it." Sturdy তখন ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সে লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল এবং ক্রোধে পাগলের মত হইয়া কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া দুই হাত ঘুরাইতে লাগিল। Goodwin ওদিকে চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছিল এবং মাঝে মাঝে সক্রোধ দৃষ্টিতে ঘাড় বাঁকাইয়া লোকটিকে দেখিতেছিল। Goodwinএর আর ধৈর্য রহিল না, সে তো হাতের কলম ফেলিয়া দিয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া, ঘুসি পাকাইয়া লোকটাকে মারিবার উপক্রম করিল। স্বামিজী তখনও বক্তৃতা সমান ভাবে করিয়া যাইতেছিলেন, সেইজন্য স্বামিজীর সম্মান রাখিবার জন্য কথা-সমাপ্তির অপেক্ষা করিতে লাগিল যেন স্বামিজীর কথা শেষ হইলেই Goodwin দৌড়াইয়া গিয়া লোকটাকে ঘুসি মারিবে। ঘরের ভিতর একদিকে Sturdy রাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর অন্যদিকে Goodwin ক্ষেপিয়া মারিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। শ্রোতারা মহা চঞ্চল হইয়া উঠিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া Sturdyকে দেখে আর একবার Goodwinকে দেখে। Foxএর কথা জড়ান ছিল এবং তত চট্‌পটে নয়, সে তো সুখাসনে বসিয়া কি অস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিল। সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক দুইজন ভারতবাসী, বিদেশ বিভুঁয়ে গোলমালে শুকাইয়া গেল এবং দুই জনই ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন স্বামিজী নিজের গম্ভীর শান্তমূর্তি ত্যাগ করিয়া অন্য এক ভীষণ মূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি ডানদিকে বাঁকিয়া আতসিখানার (fire-place) নিকট সেই ইংরেজটির দিকে মুখ করিয়া প্রায় ৩৫ মিনিট অনর্গল অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হেন্‌জেষ্ট ও হরসার সময় হইতে সেইদিনকার সময় পর্যন্ত ইংরাজ জাতি কোন দেশেতে কোন সময়ে কিরূপ অত্যাচার ও অনাচার করিয়াছে তাহার ইতিহাস অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইংরাজের গ্লানিপূর্ণ পৃথিবীব্যাপ্ত ইতিহাসটি তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইতিহাস হইতে প্রমাণ তুলিয়া এইরূপ Impeachment জগতে খুব অল্পই হইয়াছিল। ইতিহাস তাঁহার কিরূপ আশ্চর্য ভাবে পড়া ছিল এবং সমস্ত ঘটনাগুলি ঠিক পর পর সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা সেদিন তিনি আশ্চর্য ভাবে দেখাইয়াছিলেন। স্বামিজীর ইতিহাসের জ্ঞান ও Impeachmentএর ক্ষমতা দেখিয়া শ্রোতারা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন সেই ইংরাজটি সকলের সম্মুখে এইরূপ অপমানিত হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং রুমালে নাক ঝাড়িতে লাগিল। তাহার তিনখানি রুমাল নাকের জলে চোখের জলে এইরূপে ভিজিয়া গেল এবং পকেটে পুরিল। তখন তাহার নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা রহিল না, জড়পিণ্ডের মত বসিয়া রহিল। স্বামিজী ৩৫ মিনিটের পর পুনরায় শ্রোতাদিগের দিকে মুখ ফিরাইয়া স্নিগ্ধ শান্তভাবে বক্তৃতা সুরু করিলেন, "Now I come to Pratyahar (প্রত্যাহার) and Dharana (ধারণা)।" তিনি এমন গম্ভীর আওয়াজে বক্তৃতা সুরু করিলেন যেন পূর্বে এখানে কোন চাঞ্চল্য বা ঝগড়া হয় নাই। স্থির, নিশ্চল সিদ্ধ যোগীর মত দাঁড়াইয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বামিজী বক্তৃতা করিতে করিতে যে বাক্য ত্যাগ করিয়া ঝগড়া করিতে গিয়াছিলেন, ঠিক পুনরায় সেই বাক্য হইতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ভাবটা—যেখান হইতে বলিতে বলিতে তিনি বন্ধ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইখান হইতে পুনরায় অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কোনরূপ ব্যতিক্রম হইল না। চোখে ও মুখে যে ইতিপূর্বে ভীষণ ক্রোধের ভাব ছিল, তাহাই হঠাৎ অতি শান্তভাব ধারণ করিল। তাহার পর ৩৫ মিনিট বক্তৃতা হইয়া

বন্ধ হইল। সেদিন আর প্রশ্নোত্তর হইল না। জগতে এতাবৎকাল যতগুলি বিচার (Impeachment) হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিখ্যাত, যথা :—মহাভারতে শিশুপাল ও ভীষ্মের, রোমে সভাস্থলে সিসিরো কাটেলাইনের, ডেমস্থানিস্ ম্যাসিডোনের রাজা ফিলিপের এবং হ্যাম্পডেন ও পিম্ দ্বারা ওয়েনওয়ার্থ ও লর্ডের হইয়াছিল। এইগুলিই জগতের শ্রেষ্ঠ বিচার (impeachment) বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু স্বামিজীর সেদিনকার বিচারের ভাষা ও অলঙ্কার হিসাবে এই সমস্ত বিচারগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচার হইয়াছিল। এইরূপ শ্লেষপূর্ণ বক্তৃতা পূর্বে স্বামিজী কখন দেন নাই এবং বর্তমান লেখকের জ্ঞাতসারে এইরূপ উৎকৃষ্ট বিচার তিনি কখন শুনেন নাই।

বক্তৃতা বন্ধ হইলে শ্রোতারা সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্বামিজীকে বলিতে লাগিলেন, "Swami, you have taught us a grand lesson of forbearance. আমাদিগকে যদি কেহ এমন ভাবে অপমানিত করিত, তাহলে আমরা সহ্য করিতে পারিতাম না। You are a saint, you are a real great man." এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে সকলে নীচে নামিলেন, যাঁহারা বাহিরের লোক, তাঁহারা চলিয়া যাইলেন। বৈঠকখানা ঘরে স্বামিজী, Sturdy, Goodwin, Miss Muller, সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঢুকিয়া Sturdy বলিতে লাগিল, "আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিলাম। আমি কি বলেছি, কি করেছি তাহার কিছুই মনে নাই, শুধু স্মরণ আছে যে লোকটাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে গিয়েছিলুম।" সেই ইংরাজটির পরে কিছু পরিমাণে মত বদলাইয়া ছিল, কারণ বক্তৃতা বন্ধ হইলে সে Sturdyর কাছে যাইয়া মাপ চাহিয়াছিল এবং চট করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। স্বামিজীর নিকট মাপ চাহিতে যাইবার তাহার সাহস হয় নাই। Sturdy বলিতে লাগিল, "লোকটা একটা Anglo-Indian, অসভ্য চোয়াড়ে। ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্টের কি একটা ছোট চাকরি ক'র্‌তো—সেই

আস্ফালন এদেশেও দেখাতে এসেছিল।" Goodwin বলিল, "I like to thrash this man, but Swamiji gave me no chance. স্বামিজী অনর্গল বকিতে লাগিল, সেজন্যে আমি কিছু করতে পারলুম না। তা না হ'লে আমি লোকটাকে বেশ করে কোঁৎকাতুম।" স্বামিজী এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি তখন বলিলেন, "Every one is Narayana. This man too is Narayana. Only he is evil Narayana." Goodwinকে বলিলেন, "Goodwin আমার টুপি, ক্লোক্, ছড়ি নিয়ে এস।" তাহার পর বলিলেন, "চল, রাস্তায় পায়চারি করিগে যাই। Don't think otherwise of him. He is a Narayana, but only evil Narayana"—এই বলিয়া মুখে একটা সিগারেট দিয়া Goodwinকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইলেন এবং অনেক রাত্রে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

পওহারী বাবার কথা—একদিন রাত্রে বক্তৃতাকালে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, যে শরীর হইতে মনকে প্রভেদ করিয়া লইতে হয় অর্থাৎ মন কোন ইন্দ্রিয়ে সংলগ্ন থাকিবে না। মন যতই উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকিবে, ততই সাধক নূতন নূতন ভাব দর্শন করিতে পাইবে। অনেকেই মনে করে যে অল্পবিস্তর উচ্চ ভাব পাইলে খুব উচ্চ অবস্থা হইয়াছে এবং তাহার উপর আর কিছু জানিবার নাই। ইহা একটি মস্ত ভুল ধারণা। আমি গাজীপুরে পওহারী বাবা নামে একজন সিদ্ধ পুরুষের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তিনি কতদূর উচ্চাবস্থার যোগী ছিলেন, তাহা গুটিকতক উপাখ্যানেই পর্যাপ্ত। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু যেখানে মিশিয়া এক হয় সেইটা ধর্মজীবনের প্রথম আরম্ভ। সেইটাকে আসন করিয়া উত্তরোত্তর উচ্চাবস্থায় যাইতে হয়। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, যেখানে বিপরীত ভাব এক জায়গায় মিশিয়াছে অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা আসিয়াছে, সেইটাই সাধনার শ্রেষ্ঠ

স্থান। কিন্তু পওহারী বাবা বলিলেন, এইটাই ধর্মজীবনের প্রথম সোপান। পওহারী বাবা আর একটি কথা বলিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ প্রভৃতি লোক যাহারা জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন, তাঁহারা ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু খুব উচ্চাবস্থায় উঠিলে ভাব ব্যক্ত করা যায় না; ব্যক্তের চেয়ে অব্যক্ত ঢের শ্রেষ্ঠ। অনেক যোগী আছেন বা ছিলেন যাঁহারা এত উচ্চাবস্থায় উঠিয়াছিলেন যে, ভাব কোন প্রকারেই ব্যক্ত করিতে পারিলেন না, এই জন্য তাঁহারা নীরব হইয়া রহিলেন এবং বাহ্যিক জগতে উন্মাদ বা জড় হইয়া রহিলেন। কিন্তু ইঁহারা বুদ্ধ অপেক্ষা উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অব্যক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। সেই রাত্রে স্বামিজী পওহারী বাবার খুব উচ্চাবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। এই সকল কথা শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষে অতি নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কারণ সাধারণ লোকের বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতির জ্ঞান আছে এবং এই সকল লোককে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে। কিন্তু ইঁহাদের অপেক্ষা বড় সাধক হয়, এই কথা অতি আশ্চর্য ও নিতান্ত অভিনব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই রাত্রে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পওহারী বাবার উপাখ্যান শুনিতে লাগিলেন।

যীশুর মৃত্যু ও সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান—স্বামিজী রাত্রের বক্তৃতাতে একদিন বলিতে লাগিলেন যে, ইহুদীরা যখন যীশুকে ক্রুশে (হিঁঙ্গুল গাছে) পেরেক পুঁতিয়া মারে, তখন সিদ্ধ যোগীর চিত্ত সূক্ষ্ম শরীরে চলিয়া যায়। ইহুদীরা যীশুর স্থূল শরীরটাকে লইয়া জ্বালা যন্ত্রণা দিয়াছিল, কিন্তু সিদ্ধপুরুষ যীশুর তাহাতে কিছুই হয় নাই। এইজন্য এত যন্ত্রণা দিলেও তিনি স্থির ও শান্তভাব রাখিয়াছিলেন ও লোককে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

* মুসলমান গ্রন্থেও এই ভাবের কথা আছে।

স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে মানুষ কখন কখন অল্প আয়াসে

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

বা রীতিমত ধাপে ধাপে সাধন না করিয়া হঠাৎ মহাসত্য পাইয়া যায়। কিন্তু এই মহাসত্যের কি শক্তি ও সার্থকতা, নিজেও ততটা তাহা বুঝিতে পারে না। কারণ এই সত্য ও নিজের জীবনে অনেক সময় সামঞ্জস্য হয় না। কিন্তু যাহারা রীতিমত সাধনা করিয়া মহাসত্য ও উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্য বিকাশ ও জীবনের কার্য একইরূপ করিতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ মহাসত্য পাইলে তাহার সার্থকতা না জানিয়া সত্যের অপব্যয় করিয়া থাকে।

হঠযোগ—একদিন রাত্রে হঠযোগের কথা উঠিল। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, মানুষ কিসে দীর্ঘজীবী হইতে পারে, কিসে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল থাকে, ইহাই হঠযোগীদের একমাত্র লক্ষ্য। ইহা শরীরের ব্যাপার—নেতি ধৌতি করিলে হঠযোগের কার্য হয়। হঠযোগ করিলে শরীর সুস্থ রাখা যায়। আমার যেন পীড়া না হয়, আমি যেন দীর্ঘজীবী হইতে পারি, ইহাই হঠযোগীর দৃঢ় সঙ্কল্প। ইহার দ্বারা হঠযোগী দীর্ঘজীবী হন। শতবর্ষ জীবিত থাকা হঠযোগীর পক্ষে তুচ্ছ কথা, ৫০০।৭০০ বৎসর শরীর রাখা হঠযোগীর পক্ষে অসাধ্য সাধন নয়। ১০০।১৫০ বৎসর হইলেও হঠযোগীকে দেখিবে—তিনি পূর্ণ যুবা ও সতেজ রহিয়াছেন, তাহার একটি কেশও শুভ্র হয় নাই। হঠযোগীদের দুই একটি সাধারণ উপদেশ বড় উপকারী। শিরঃপীড়া হইলে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিকা দিয়া ঠাণ্ডা জল পান করিবে; তাহা হইলে সমস্ত দিনই তোমার মস্তিষ্ক শীতল থাকিবে, তোমার কখন সর্দ্দি লাগিবে না। ইহাতে বিশেষ উপকার হয় এবং একাজ বিশেষ অসাধ্য নয়। কিন্তু হঠযোগে মনের উন্নতির কোন সংস্রব নাই, ইহা শুধু দেহ লইয়াই ব্যস্ত। রাজযোগ শুধু মন উন্নত করিবার একমাত্র সহায়।

হঠযোগী হরিদাসের কথা—স্বামিজী হঠযোগী হরিদাসের কথা বলিতে লাগিলেন। এই উপাখ্যানটি তিনি নীচেকার ঘরে ও উপরকার ঘরে বলিয়াছিলেন। হরিদাস একজন বিশিষ্ট হঠযোগী ছিলেন। তিনি

পাঞ্জাবের মহারাজ রণজিৎ সিংএর সভায় যান ও তথায় হঠযোগের প্রক্রিয়া দেখান। মহারাজ রণজিৎ সিং দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হন। হরিদাস হঠযোগের আসনে বসিলেন এবং নিষ্পন্দ হইয়া গেলেন। তখন তাহার শরীরটা একটা পাথরের সিন্ধুকের ভিতর রাখা হইল এবং সিন্ধুকের ডালাটা পেরেক দিয়া শক্ত করিয়া বন্ধ করা হইল। তাহার পর সিন্ধুকের গায়ে লোহার শিকল জড়ান হইল। তাহার পর একটি ময়দানে, মাটী খুঁড়িয়া তাহার ভিতর পুঁতিয়া রাখা হইল। তাহার উপর গমের চাষ করা হইল। গম ছড়ান হইল, গম পাকিল, গম কাটা হইল। তাহা হইলে অন্ততঃ পাঁচ ছয় মাস সময় যাইবে। তাহার পর সেই সিন্ধুকটি পুনরায় গর্ত খুঁড়িয়া বাহির করা হইল, শিকল খুলিয়া, ডালা খুলিয়া তাঁহাকে বাহির করা হইল। তখন তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রের স্থানটি একটু গরম ছিল। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার মেরুদণ্ডে নানা প্রকার গাছের রস মালিস করিতে করিতে পুনরায় তাঁহার চেতনা আনিল এবং তিনি বেশ সুস্থ অবস্থার লোক হইলেন। মহারাজ রণজিৎ সিং তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত প্রত্যাখান করিয়া চলিয়া আসেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি যখন কাশীতে বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার তত উচ্চাবস্থা ছিল না। হঠযোগে মনের কোন উন্নতি হয় না, শুধু শরীর সুস্থ থাকে।

ড্যাচেস্ অফ আল্‌বানি—বক্তৃতা খুব জমিয়া গিয়াছে, সকালের বক্তৃতায় খুব লোক সমাগম হইতেছে। অনেক ভদ্র মহিলা আসিতে লাগিলেন। সদর দরজায় অনেক গাড়ি লাগিল। একটা বেশ গুলজার ব্যাপার হইল। বর্তমান লেখক ও সারদানন্দ স্বামী থামের আভ্যন্তরীণ সিঁড়ির উপর গিয়া বসিলেন। হাঁসপাতালের নার্স টি চাতালের উপর চেয়ার পাতিয়া বক্তৃতা লিখিতে লাগিলেন। বক্তৃতা অতি প্রাণস্পর্শী হইতে লাগিল এবং সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে সকলে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া

নামিয়া গেলেন। বর্তমান লেখক ও সারদানন্দ স্বামী সিঁড়ির উপরকার ধাপ হইতে নীচেকার চাতালে আসিলেন। বড় ঘরে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটু চোখ ঠেরা-ঠেরী, আঙ্গুলে আঙ্গুলে টেপা-টেপী ও কানে কানে ফুস্‌ফুসনি হইতে লাগিল। সকলেই কোন একটী বিশিষ্টা স্ত্রীলোককে আড়নয়নে ও সংযতভাবে দেখিতেছে। সেই বিশিষ্টা মহিলাটী চলিয়া গেলে, কেহ কেহ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল—"She is Duchess of Albany, She is Duchess of Albany।" তার পর প্রকাশ পাইল তিনি অপরিজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্নভাবে স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার এক সহচরী বক্তৃতা শুনিয়া যাইতেন এবং সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিতেন। রাজবাটীর রমনীদের রাণী ভিক্টোরিয়ার অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র যাওয়া নিষেধ ছিল। Duchess of Albany মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চতুর্থ পুত্রবধু, এইজন্য তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অর্থাৎ কেহ না চিনিতে পারে এইভাবে আসিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে চলিয়া গেলেন।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে স্বামিজী বক্তৃতাকালে একটা কথা তুলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে অনর্গল বলিয়া যাইতেন। এই জন্য কোন দিবস বক্তৃতাকালে কি কি উপাখ্যান বলিয়াছিলেন, তাহা মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে তিনি উপরকার ঘরে রাজযোগের বক্তৃতাকালে এই এই উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। ইহার বেশী বোধ হয় শ্রোতাদিগের স্মরণ নাই। কারণ বক্তৃতাকালে তিনি শব্দের অতীত এক নূতন রাজ্যে লইয়া যাইতেন, এইটা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। শব্দ, তর্ক, বস্তু নামতঃ একটা উপকরণ মাত্র।

বাৎসল্যভাব—রোজ রোজ ধ্যান ধারণার কথা বলা হয়, নিতান্ত নীরস বিষয়, অনেকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এই জন্য স্বামিজী মুখ বদলাইয়া লইবার জন্য ভক্তির বিষয় বলিতেন। একদিন তিনি সকলকে বিশেষ করিয়া মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে,

হিন্দুদিগের ভিতর এক প্রকার সাধনা আছে—ভগবান বা ইষ্টকে নিজের সন্তানভাবে সাধনা করা। সাধারণতঃ সন্তানকে দেহজ এইভাবে তাহার মাতা পালন ও স্নেহ করিয়া থাকে। এই ভাবটি বদ্ধ ও সীমাবিশিষ্ট। কিন্তু সেই সন্তানভাবের সহিত যদি ঈশ্বরভাব আরোপিত করা হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর বা ইষ্ট শিশু সন্তানরূপে ক্রোড়ে বসিয়া আছেন এবং তাঁহাকেই লালন পালন করা যাইতেছে, তাহা হইলে হৃদয়ে একটা দেবভাবের উদ্রেক হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হইয়াছে তাহাদের পক্ষে এই ভাবটা অনেকটা সহজ। কারণ তাঁহারা সন্তান-স্নেহ কি তাহা জানেন। শুধু দেবভাব সন্তান-স্নেহের সহিত সংযোজিত হইয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও স্বার্থপরতার পরিধি অতিক্রম করিয়া মনটাকে উচ্চ অবস্থায় লইয়া যায় এবং পরে ব্রহ্মে লীন হয়।

খ্রীষ্টানদিগের ভিতর মেরী ভগবান যীশুকে স্তনন্ধয় বা দুগ্ধপোষ্য শিশুভাবে কোলে করিয়া আছেন। এইটিকে ম্যাডোনা (Madona) বলে। এই ভাবে সাধন করিলে স্ত্রীলোকের ভিতর শীঘ্র উচ্চ দিকে মন যায়। স্বামিজী যশোদার গোপাল ভাব ও খ্রীষ্টানদের বালক খ্রীষ্ট এই দুই ভাব পরস্পর মিলাইয়া সেদিন অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

মধুর ভাব—একদিন বক্তৃতায় স্বামিজী মধুর ভাবের কথা বলিতে লাগিলেন। ভগবান বা ইষ্ট বা বল্লভ (The most beloved) কে স্বামী ভাবে সাধন করা। তিনিই প্রভু, তিনিই স্বামী, তিনিই রক্ষক এই ভাবে সাধনা করিলে দৈহিক সম্পর্ক বা দেহজ্ঞানের ভাব কমিয়া যায়। ভিতরে একটা স্নিগ্ধ, পবিত্র প্রীতির ভাব জাগ্রত হয়। এই ভাবটি হিন্দুদিগের বৈষ্ণবশাস্ত্রের ভিতর খুব আছে। খ্রীষ্টানদিগের ভিতর সেণ্ট ক্যাথারিনের মধুর ভাব ছিল এবং তাহার দ্বারাই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

বর্তমান লেখক লণ্ডনে National Art Gallery, Charing

Crossএ একখানি যীশু ও সেণ্ট ক্যাথারিন বর কনের পোষাকে আংটী বদ্‌লাবদলী করিতেছে, এই ভাবের একখানি বড় তৈলচিত্র দেখিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেণ্ট ক্যাথারিনের সহিত যীশুর বিবাহ হইতেছে।

রমণীদিগের "বল্লভ" (The most beloved) এই ভাবটী খুব স্বাভাবিক। ইষ্টকে বল্লভভাবে সাধনা করিলে শীঘ্রই উচ্চদিকে মন যায়। এই ভাবটী স্বামিজী ধীরে ধীরে এমন ভাবে বলিতে লাগিলেন এবং মনের এত উচ্চভাব খুলিতে লাগিলেন যে, সকলে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা একটা নূতন পথ দেখিতে পাইল। এই কয়দিন স্বামিজী ভক্তিতে পূর্ণ ছিলেন। রাজযোগের অথবা কঠোর তর্ক বিতর্কের কথা একেবারেই তাঁহার মুখে ছিল না। ভক্তির বক্তৃতা কয়টী অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

নির্ভর—রাত্রের বক্তৃতাকালে ভক্তির কথা চলিল, পরে নির্ভরের কথা উঠিল। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বর সান্নিধ্যজ্ঞান আসিলে নির্ভর আসে। আমার কথা একজন অলক্ষিতভাবে নিকটে থাকিয়া শুনিতেছেন এবং নিশ্চয় তিনি আমার আকাঙ্খা পূর্ণ করিবেন, এই জ্ঞান হওয়াকে নির্ভর বলে। নির্ভর আসিলে মানুষ স্থির হইয়া উঠে আর বুকে জোর আসে এবং কথাবার্তায় জোর হয়। অনেকেরই ধারণা যে, ঈশ্বরচিন্তা করিব, তাহা হইলে খাইতে দিবে কে? কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে সকলকে বলিতেছি, আমার সঙ্গে চলুন, খাইবার জন্য কোন আশঙ্কা করিবার দরকার নাই। যে দেশে যাইব, যে সহরে যাইব, যে গ্রামে যাইব, সেই খানে উৎকৃষ্ট আহার্য বস্তু আপনি আসিবে। ইহার জন্য চিন্তা করিবার কিছুই নাই। আমি নিজের জীবনে এ কাজ করিয়া দেখিয়াছি। I never preach what I do not practise—আমি নিজে যে কাজ করে দেখিনি বা উপলব্ধি করিনি, সে কথা আমি অপরের কাছে প্রচার করি না। নির্ভর থাকিলে কোন ভাবিবার কথা বা কারণ থাকে না। সেই দিন

স্বামিজী অনেক আশাপ্রদ কথা অনর্গল বলিতে লাগিলেন। সকলের ভিতর একটা তেজ আসিল। হইবে কি না, পারিব কি না, এই ভাবটা চলিয়া গেল। নিশ্চিত হইতে পারে—এই ভাবটা সকলের ভিতর জাগ্রত হইল।

উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি গল্প বলিতে লাগিলেন। ইউরোপে মধ্যযুগে অনেক সন্ন্যাসী (monk) এবং ভিক্ষু (Friar) ছিলেন। তাহাদের ভিতর অনেকে খুব উচ্চ অবস্থার লোক হইয়াছিলেন। একটি এইরূপ গল্প আছে যে একটি ভিক্ষু (Friar) স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য দেশে প্রচার করিতে যান। স্থানটা পাহাড়, গ্রাম বা লোকালয় নাই, তিনি চলিতে লাগিলেন। সেই সাধুটীর ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা, ভক্তি ও নির্ভর ছিল। প্রথম দিন কিছু আহার করিতে পাইলেন। রাত্রিটা কোন রকমে পাহাড়ে যাপন করিয়া তিনি পরদিবস আবার চলিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিন ত কোন আহার পাইলেন না। রাত্রি 'যেন তেন প্রকারেন' যাপন করিয়া পরদিবস আবার চলিতে লাগিলেন। কিছু দূরে গেলেন, শরীর বড় ক্লান্ত, পাহাড়ে হাঁটিতে কষ্ট হইতেছে। এমন সময়ে একটা ঈগল পক্ষী একটা মাছ লইয়া উড়িয়া যাইতেছিল, তাহার পা খুলিয়া মাছটি সাধুর সম্মুখে পড়িয়া যাইল। সাধুটি উপরে মাথা তুলিয়া দেখিলেন যে একটি ঈগল উড়িয়া যাইতেছে। সাধুটি ঈশ্বরের স্তব ও মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। সাধুটি কাঠ যোগাড় করিয়া মাছটি পোড়াইয়া আহার করিলেন। মাছ খাইয়া কথঞ্চিৎ সবল হইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। নির্ভর থাকিলে অবশ্য কার্যসিদ্ধি হইবে। আহারের জন্য কোন প্রতিবন্ধক হয় না, আহার আপনি আসিবে। বর্তমান লেখকের সেদিন এই কথাটি অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল। সেই দিন ভক্তি, নির্ভর ও আশাপূর্ণ বাণী স্বামিজীর মুখ হইতে অনর্গল বাহির হইতে লাগিল।

যুধিষ্ঠিরের কুকুর লইয়া স্বর্গে যাওয়া—মহারাজ যুধিষ্ঠির বহু

বর্ষ রাজত্ব করিয়া অবশেষে তাঁহার বৈরাগ্য আসিল। তিনি তাঁহার অপর চারিজন ভাই ও রাণীকে সঙ্গে লইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বর্গগমনে মনস্থ করিলেন। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে এক প্রথা আছে যে, বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া তপোবনে যাইয়া ঈশ্বর চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। সাধারণ লোক যেমন ঈশ্বর-চিন্তার জন্য অরণ্যে বাস করিত, সিংহাসনারূঢ় রাজা মহারাজদের পক্ষেও সেই নিয়ম ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও রাণীকে লইয়া হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন। গমনকালে এক কুকুরও তাঁহার সঙ্গে চলিল। কুকুর ভারতবর্ষে অস্পৃশ্য, কাছে আসিতে দেওয়া হয় না এবং কুকুর কোন আহার্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে তাহা ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির ন্যায়পরায়ণ ও সমদর্শী, কুকুরটী সঙ্গে যাওয়াতে কোন প্রতিরোধ করিলেন না। পাহাড়ে বরফ—রাজপুত্রেরা সুখে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন—পদব্রজে যাইতে যাইতে মহারাণী দ্রৌপদী পড়িয়া গেলেন এবং তাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বড় ভালবাসিতেন কিন্তু তিনি স্থির, অবিচলিত, নিশ্চল, কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। ঈশ্বর-লাভই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। পথে চলিতে চলিতে একমাত্র যুধিষ্ঠির ছাড়া এইরূপে সকল ভ্রাতারই মৃত্যু ঘটিল। প্রাণতুল্য ভাইদের মৃত্যু হইতেছে, তথাপি তিনি স্থির, নিশ্চল, একমাত্র ঈশ্বর-লাভই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি বরফের রাস্তা দিয়া আরো উচ্চে উঠিতে লাগিলেন। উপাখ্যানে আছে যে স্বর্গের দ্বারপালেরা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পুণ্যাত্মা লোক, আপনি স্বর্গে প্রবেশ করুন কিন্তু কুকুর অস্পৃশ্য, আপনি কুকুরটিকে ত্যাগ করিয়া একলা স্বর্গে প্রবেশ করুন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কুকুর আমার আশ্রিত এবং নিঃস্বার্থ-ভাবে আমার অনুসরণ করিতেছে। সে কোন প্রত্যাশা করে না এবং

অনেক কষ্টে তুষার উত্তীর্ণ হইয়া আমার সহিত আসিতেছে, এইরূপ আশ্রিত ভক্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে দেবদূত! আপনার ইচ্ছা হয়, আমাদের উভয়কে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিন। কিন্তু যদি এই আশ্রিত ভক্তকে ত্যাগ করিয়া আমাকে স্বর্গে প্রবেশ করিতে হয়, আমি স্বর্গে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা পুনরায় মর্ত্যে ফিরিয়া যাইব।" দেবদূত দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার সেই এক প্রশ্ন করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির মর্ত্যে ফিরিতে মনস্থ করিলেন। কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া সেই পার্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া মর্ত্যে ফিরিয়া আসিবেন এবং হয়ত পথিমধ্যে আত্মীয়দের মৃতদেহ দেখিতে পাইবেন, কিন্তু এই সকল চিন্তা তাহার মনকে চঞ্চল করিতে পারিল না। তিনি আশ্রিত কুকুরটিকে ত্যাগ করিবেন না, এই সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন, এমন সময়ে কুকুরটি তাহার দেহ পরিবর্তন করিয়া ধর্মরূপ ধারণ করিল এবং যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিল, "মহারাজ, আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি কুকুররূপ ধারণ করিয়াছিলাম। কুকুরকে কেহ আশ্রয় দান করে না, কিন্তু আপনি আশ্রয় দান করিলেন। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়াই রাজার প্রধান ধর্ম, ইহাই আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। তার পর দেখিলাম যে, আপনার মহারাণী দ্রৌপদী ও দেবকল্প ভ্রাতৃচতুষ্টয় আপনার সম্মুখে দেহত্যাগ করিল, কিন্তু তাহাতেও আপনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য দৃঢ়মতি হইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন ধর্মদ্বারে আসিয়া শুনিলেন যে আশ্রিত অস্পৃশ্য কুকুরটিকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গ ও ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে, তখন আপনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। আশ্রিতকে ত্যাগ করা ও ঈশ্বর লাভ, এই উভয় চিন্তা আপন চিত্তকে প্রমথিত করিল এবং আপনি স্থির করিলেন—স্বর্গলাভ তুচ্ছ, ঈশ্বর লাভ তুচ্ছ। আশ্রিতকে রক্ষা করাই ধর্ম। এই জন্য স্বর্গপ্রবেশ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মর্তলোকে প্রত্যাবর্তন করাই স্থির করিলেন।

আপনার এই সকল মহান্ উচ্চ ভাব দেখিয়া আমি খুব প্রসন্ন হইয়াছি। আপনি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন ও ত্যাগ করিতে পারেন, কেবল ধর্মকে অবলম্বন করিয়া থাকেন, এইজন্য কুকুররূপ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ ধর্মরূপে আপনার সম্মুখে আবির্ভূত হইলাম। যথার্থই আপনার ধর্ম আছে, নিঃস্বার্থ ধর্ম কি তাহা আপনি বুঝিয়াছেন। আপনি যথা অভিরুচি স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন।"

ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা অনেকেই কুকুর পুষিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির একটা কুকুরের জন্য স্বর্গ গমন ত্যাগ করিয়াছিলেন, এইটা তাঁহাদের বড়ই আনন্দের উপাখ্যান হইল। রাজযোগের বক্তৃতা শুনিয়া অনেকেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, এইজন্য স্বামিজী ছোট ছোট উপাখ্যান তুলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন; তাহাতে বক্তৃতাটি বেশ সহজ ও সরল হইত এবং রাজযোগের ভাব ও উদ্দেশ্য সহজেই তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন।

ভালবাসার জন্যই ভালবাসি—স্বামিজী যুধিষ্ঠিরের আর একটি উপাখ্যান তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাইতেছেন, অতি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ও তাহার উপর অজস্র তুষার রহিয়াছে। বহুকাল ধরিয়া তুষাররাশির সমাবেশে এক অপূর্ব শোভা সৃষ্টি করিয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, পথের পথিক হইয়াছেন। জগতের ভোগ্য বস্তু কিছুতেই আর তাঁর স্পৃহা নাই। তিনি ব্রহ্ম লাভের জন্য স্বর্গ গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি তুষাররাশির অপূর্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে উপরে উঠিতে লাগিলেন, অতি উচ্চ তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"গিরি! আমি তোমার নিকট কোন বস্তুর প্রার্থনা করি না, কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করি না, আমার আকাঙ্ক্ষা একেবারে নিবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু তোমার অপূর্ব গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ ও প্রীত হইয়াছি। তোমাকে ভালবাসার জন্যই তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে দেখিবার জন্যই

দেখি। তোমার কাছে কোন আকাঙ্ক্ষা করি না। কারণ এ দুইই আমার কাছে সমান। কিন্তু তোমার অতীব মাধুর্যের জন্য তোমাকে ভালবাসি। আমার প্রাণটা যেন তোমার সৌন্দর্যের সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে।" ফল ও আকাঙ্ক্ষা অতি তুচ্ছ জিনিস, ভালবাসার জন্য ভালবাসা, এইটাই শ্রেষ্ঠ জিনিস।

সেই রাত্রের বক্তৃতাটি অতি গভীর ভাবের হইয়াছিল। স্বামিজীর মুখ অতি গম্ভীর ও চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত। নিঃস্বার্থ ভালবাসা যে কি এবং ভগবানের কাছে ফল আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা ভগবানকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি বেশ বুঝাইয়া দিলেন।

মানুষ আপনার প্রবৃত্তি-ক্রিয়া অনুযায়ী জগৎ দেখে—স্বামিজী একদিন রাত্রের বক্তৃতায় বলিতে লাগিলেন, "মানুষ আপন আপন প্রবৃত্তি-ক্রিয়া অনুযায়ী জগৎ দেখে। বাহ্যিক জগৎ আর কিছুই নয়, কেবলমাত্র নিজের ভিতর হইতে যে শক্তির বুদ্বুদ উঠিতেছে, সেইটাই বস্তুরূপ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতেছে; তাহাকেই আমরা দ্বিতীয় বস্তু বা বাহ্যিক জগৎ বলিয়া লইতেছি। বাস্তবিক বাহ্যিক জগৎ আছে কিনা সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই, আর যদি থাকে অতি সামান্য ভাবে আছে। The external world is created by self-projection. But whether there is outside world apart from my mind is doubtful অর্থাৎ আমার মন ছাড়া বাহিরের জগৎ আছে কিনা এ বিষয়ে খুব সন্দেহ। কারণ মন দিয়াই বাহ্যিক জগৎ দেখিতেছি। কেহ বা জগৎকে শান্তিপূর্ণ দেখিতেছে, কেহ বা দেখিতেছে—মহা তুফান, মহা গণ্ডগোল। এক ব্যক্তি দেখিতেছে সকলেই তাহার বন্ধু, তাহার জীবন-সুহৃদ, অপর এক ব্যক্তি দেখিতেছে জগৎ তাহার শত্রু, তাহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক জগৎ আছে কিনা তাহার কোন স্থিরতা নাই, আর যদিই বা থাকে তাহা

ভাব উদ্রেক করিবার জন্য সামান্য একটু বস্তু আর বাকি সবটাই নিজের অধ্যাস বা projection দিয়া সৃষ্টি করা হয়।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি এই উপাখ্যানটি বলিলেন।

রাত্রে এক চোর চুরি করিতে বাহির হইয়াছে। কিছু পথ গিয়া সে মাঠের ধারে দেখিল—একটা উঁচুমত কি জিনিস রহিয়াছে। চোরটা মনে করিল যে আর একটা চোর চুরি করিবার জন্য সেখানে গুড়িশুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। চোরটা বলিতে লাগিল, "কি ভায়া, রাত্রে কাজটাজ কেমন চলছে, আর রাত্রি এখনও অনেক বাকি রয়েছে, এক জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকলে কি কাজ হয়, পাঁচ জায়গায় না ঘুরলে কি রোজগার হয়।" উঁচু জিনিসটা থেকে কোন প্রত্যুত্তর আসিল না দেখিয়া চোরটা পুনরায় বলিল, "কি বাবা, মাল সাট ক'রে গ্যাট হ'য়ে বসে আছ, থোক্-থাক্ কিছু মেরেছ বুঝি, তাই আর কাজ করতে চাইছো না, আর আমি এখনও মাল খোঁজ করবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।" এই কথা বলিয়া চোরটা চলিয়া গেল।

কিছু পরে এক মাতাল সেই উঁচু জিনিসটা দেখিয়া বলিতে লাগিল, "কি বাবা, ঘুপটি মেরে কোন মাগীর জন্য বুঝি ওৎ ক'রে বসে আছ। আচ্ছা বাবা, আমিও এক চক্কর ঘুরে আসি, তারপর তোমার মুখের শিকার ছিনিয়ে নেবো।"

তার পর এক সাধু আসিল। সাধুটি সেই উঁচু জিনিসটা দেখিয়া বলিতে লাগিল, "নিজে নিজে বেশ মজা মারছো। মাঠের ধারে সমস্ত রাত্রি জপ করছো, আর আমাকে এমনি বোকা মনে করলে যে আমি রাত্রিটা বেড়িয়ে আর ঘুমিয়ে কাটাব। আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ছি না, এই বসলুম, আমিও সমস্ত রাত্রি জপ করবো।" এই বলিয়া সাধুটি উঁচু জিনিসটার পাশে বসিয়া জপ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে চোর ও মাতাল শেষ রাত্রে ফিরিয়া আসিল, তাহারাও আসিয়া যে যার অভীষ্টের জন্য সেই উঁচু

জিনিসটার পাশে বসিল এবং অপর কেউ না টের পায়, সেইজন্য নিজ নিজ মনোভাব গোপন করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। ক্রমেই সকাল হইল, তখন সকলেই দেখিল—উঁচু জিনিসটা চোরও নয়, মাতালও নয়, জাপকও নয়, একটা গাছ কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, তার গুঁড়ির (স্থানু) খানিকটা। তখন পরস্পরে নিজের মনের কথা খুলিয়া বলিল। তাই জগৎটা হচ্ছে—কেবল ভাব উদ্রেক করিবার বস্তু।

সুবর্ণ নকুল ও উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের কথা—একদিন রাত্রের বক্তৃতায় জীব-সেবার কথা উঠিল। জীব-সেবা সাধনার একটি পথ। নিজের প্রাণ দিয়া জীব-সেবা করাও একটা মহাব্রত। স্বামিজী সুবর্ণ নকুলের উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ হইয়াছে, অনেক দেশের রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়াছেন, অনেক ঋষি ও আচার্য আসিয়াছেন, ঋষি ও আচার্যদিগকে অনেক দান-ধ্যান করা হইয়াছে এবং রাজাদিগকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হইয়াছে। পৌরজন ও প্রকৃতিপুঞ্জকে বিশেষ পরিতোষ পূর্বক আহারাদি করান হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মন খুব প্রফুল্ল, তিনি মনে করিলেন—তাঁহার মত রাজসূয় যজ্ঞ কেহ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ ভাবে সফল হইয়াছে।

সকলে বসিয়া আছেন, যজ্ঞের হোমকুণ্ডে তখনও ভস্ম রহিয়াছে, কোথা হইতে একটা নকুল আসিল, তাহার একদিক সাধারণ মাংসের এবং অপর অংশ সুবর্ণের। নকুলটি আসিয়া সেই যজ্ঞ-ভস্মের উপর খানিকক্ষণ গড়াগড়ি দিল এবং তারপর বলিয়া উঠিল, "হ'ল না, হ'ল না, হ'ল না।" তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্তম্ভিত হইয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ, নকুল কি বলিতেছে, ওর কথা ত কিছুই বুঝিতে পারি না।" কৃষ্ণ তখন নকুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নকুল, তুমি কি বলিতেছ?" নকুল পুনরায় বলিল, "হ'ল না, হ'ল না, হ'ল না।" তখন কৃষ্ণ অতি

সসম্ভ্রমে নকুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল না, তুমি যজ্ঞের ভস্মে গড়াগড়ি দিতেছ আর বলিতেছ হ'ল না, হ'ল না, আমাদের যজ্ঞে কি কোন অপূর্ণতা আছে?" তখন নকুল বলিল "আমি এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের যজ্ঞে গিয়াছিলাম, তাহার হোমের বিভূতিতে গড়াগড়ি দিয়া আমার এক অংশ স্বুবর্ণের হইয়াছে। তাই মনে করিলাম—মহারাজ যুধিষ্ঠির ত যজ্ঞ করিলেন, তাঁহার যজ্ঞভস্মে গড়াগড়ি দিলে যদি শরীরের বাকি অংশটা স্বুবর্ণের হয়, তা হ'ল না। সেই জন্য আক্ষেপ করিতেছি।"

কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের যজ্ঞ কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল?" নকুল বলিতে লাগিল যে, এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ পরম নিষ্ঠাবান ও সাধক, তিনি কাহারও নিকট হইতে কোন জিনিস গ্রহণ করিতেন না। ক্ষেত্রে শস্য কাটিয়া লইয়া গেলে, শস্যের যে অল্পমাত্র মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে, তিনি সেইগুলি মাত্র কুড়াইয়া রাখিতেন এবং তাহাই মাত্র আহার করিয়া দিন যাপন করিতেন এবং অবশিষ্ট সময় নিজের সাধন ভজন লইয়া থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে উচ্চ অবস্থার সাধক বলিয়া সকলে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিল। এক সময়ে সেই প্রদেশে আকাল পড়িল; অনাবৃষ্টি, কোনপ্রকার ফসল হয় নাই, লোকজন অনেক মারা গেল, অনেকে অন্যত্র চলিয়া গেল। কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ নিজের গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গেলেন না। তখনও তাঁহার অল্প ছাতু অবশিষ্ট ছিল। দিন কতক পরে আর এক বেলার মত ছাতু অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে একজন ঋষি তাঁহার বাটীতে আসিলেন এবং বলিলেন, "আমি বড় ক্ষুধার্ত, কিছু খাওয়াইয়া অতিথি সৎকার কর, আমি কয়েক দিন আহার করি নাই, না খাইলে আমার প্রাণ যাইবে।" ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন। তিনি জপধ্যান সমাপন করিয়া শক্তু বা ছাতু জল দিয়া মাখিয়া কয়েকটি নাড়ু করিলেন। বাটীতে তাঁহাদের খাইতে ব্রাহ্মণ নিজে, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার

পুত্র ও পুত্রবধূ। ব্রাহ্মণ নিজের অংশটি লইয়া ঋষিকে দিলেন। ঋষি খাইয়া বলিলেন, "আমার ক্ষুধা শত গুণ বর্দ্ধিত হইল; আর কিছু যদি খাইতে না দেন, তাহা হইলে আমার প্রাণ যায়।" সাধ্বী ব্রাহ্মণী বলিলেন যে, তাঁহার নিজের অংশটি ঋষিকে দেওয়া হউক। ছাতুর সে নাড়ুটিও ঋষি খাইয়া ফেলিলেন এবং পুনরায় ক্ষুধার কথা জানাইলেন। তারপর পুত্র এবং পুত্রবধূও নিজের নিজের অংশের নাড়ু ঋষিকে খাইতে দিলেন। ঋষি তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। তখন আর তাঁহাদের কিছুমাত্র আহার্য রহিল না। সেই রাত্রেই এই ব্রাহ্মণ পরিবার বর্গের মৃত্যু হয় এবং নিজের প্রাণ দিয়া অপরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, এই জন্য সকলেই স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সেই ব্রাহ্মণ যেই স্থানে নিত্য হোম করিতেন, সেই ভস্মে এবং যেস্থানে সেই ঋষি আহার করিয়াছিলেন, সেই মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার অর্দ্ধেক অঙ্গ স্নুবর্ণের হইয়াছে। ঋষির সেই যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হইয়াছিল। শুনিলাম মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন, তাই এস্থলে আসিয়াছিলাম যদি আর অর্দ্ধেক অঙ্গ স্নুবর্ণের হয়। কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের যজ্ঞের পরিমাণেও যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ হয় নাই, তাই এখন ফিরিয়া যাইতেছি। এই গল্পটি অতি স্নুন্দরভাবে হইয়াছিল এবং জীব-সেবা করা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এইটি বেশ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর গল্প—স্বামিজী অতিথি সৎকারের আর একটি উপাখ্যান বলিলেন। এক বৃক্ষে এক বিহঙ্গম ও বিহঙ্গমী বাস করিত, তাহাদের দুইটি শিশু-সন্তান ছিল। এক শীতকালের রাত্রে এক ঋষি সেই গাছের তলায় আসিয়া বসিলেন। লোকটি সারাদিনে অতি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও শীতক্লিষ্ট। ঋষিটি বসিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বিহঙ্গম বিহঙ্গমীকে বলিতে লাগিল, "আমরা গৃহী, গৃহস্থ আশ্রমে বাস করিতেছি, একটি ক্ষুধার্ত অতিথি আসিয়া

আমাদের গৃহে আশ্রয় লইয়াছে, অতিথি সৎকার প্রধান ধর্ম”—এই বলিয়া বিহঙ্গমটি উড়িয়া গেল, মুখে করিয়া কাঠ আনিয়া বারে বারে সাধুটির সম্মুখে ফেলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি কাঠ হইল। তারপর জ্বলন্ত একটি গাছের ডালের এক অংশ ঠোঁটে করিয়া ধরিয়া সেই কাঠের কাছে ফেলিয়া দিল। সাধুটি সেই আগুনটুকু লইয়া কাঠগুলি ধরাইলেন এবং শীতে আগুন সেঁকিয়া অনেক পরিমাণে সুস্থ হইলেন। তারপর বিহঙ্গম বিহঙ্গমীকে বলিতে লাগিল, “ক্ষুধার্ত অতিথি আসিয়াছে, ইহাকে কিছু আহার্য দেওয়া আবশ্যক। আমরা পক্ষীজাতি, তণ্ডুলকণা আহার করিয়া থাকি, মনুষ্যোচিত আহার্য আমাদের কিছুই নাই। তবে একটা উপায় স্থির করিয়াছি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর বেশীদিন বাঁচিব না, আমি আমার দেহ অগ্নিতে সমর্পণ করি, আমার মাংস আহার করিয়া ঋষির ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে এবং আমাদেরও অতিথি সৎকার হইবে।”

সাধ্বী বিহঙ্গমী বলিল, “তা কি করিয়া হইতে পারে? আমি তোমার স্ত্রী, আমারই ধর্ম অতিথি সেবা করা, আমিই অগ্নিতে দেহ সমর্পণ করিব।” বিহঙ্গম বলিল, “সন্তানগুলি শিশু, পিতার মৃত্যু হইলে মাতা সন্তানগুলির লালন পালন করিতে পারে, কিন্তু মাতার মৃত্যু হইলে পিতা শিশুসন্তান পালন করিতে বিশেষ কষ্ট পায়।” এইভাবে বাদানুবাদ করিতে লাগিল। শিশুসন্তান দুইটি বলিল, “পিতা মাতা উভয়ের সেবা করা সন্তানের প্রধান কর্ত্তব্য। সন্তান বর্তমান থাকিতে পিতামাতার মৃত্যু হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। এইজন্য শিশুদ্বয় নিজেদের দেহ দিয়া অতিথি সৎকার করিবে।” এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা হইতেছে এমন সময় সেই প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখায় শিশুসন্তান দুইটি ঝাঁপ দিয়া পড়িল। শাবক-দুইটির দগ্ধ মাংস ভক্ষণ করিয়া সেই ঋষির ক্ষুধা কথঞ্চিৎ নিবারিত হইল। তাহার পর বিহঙ্গম বিহঙ্গমীও অগ্নিকুণ্ডে পড়িল এবং তাহাদের দগ্ধ মাংস খাইয়া সাধুটি সুস্থ হইলেন।

ঋষিটি আহার করিয়া আগুন সেঁকিতেছেন, এমন সময় দেখেন যে, সম্মুখে এক জ্যোতির্ময় দেবদূত আসিয়া উপস্থিত এবং সেই অগ্নিভস্ম হইতে পক্ষী চারিটির ভস্ম লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "ঋষি, এই পক্ষী চারিটি গৃহস্থ হইলেও পরম ধার্মিক। ইহারা যে আত্মত্যাগ দেখাইল, সেই পুণ্য ফলে ইহারা ঋষিত্ব অতিক্রম করিয়া স্বর্গে গমন করিবে। গৃহস্থ অবস্থায় থাকিলেও শ্রেষ্ঠ অবস্থা পাইতে পারে।" এই গল্পটিতে স্বামিজী—সেবাভাব ও গৃহস্থ আশ্রমে থাকিলেও যে অতি উচ্চাবস্থা লাভ করা যাইতে পারে, এইটি বুঝাইতে লাগিলেন।

ধর্ম-ব্যাধ—একদিন রাত্রের বক্তৃতায় স্বামিজী ধর্ম-ব্যাধের উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন। এক ঋষি বা সাধু এক গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষা করিতে যান। গৃহকর্ত্রী সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এই জন্য ভিক্ষা দিতে কিঞ্চিৎ দেরী হইল। সাধুটি বড় রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমি অতিথি, তোমার দ্বারে আসিয়াছি, তুমি আমায় ভিক্ষা দিতে দেরী করিলে, আমায় অবজ্ঞা করিলে, আমি তোমায় ভস্ম করিব।" সাধুটি অরণ্যে কিছুদিন তপস্যা করিয়া কিছু শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এবং এই গর্বে তিনি সকলকে যে ইচ্ছামাত্র ভস্ম করিয়া দিতে পারেন, তাহা বলিয়া বেড়াইতেন। গৃহকর্ত্রী গৃহাভ্যন্তর হইতে তাঁহার এই ক্রোধোক্তি শুনিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এ কাগি বগি পাও নি যে, একবার চোখ রাঙ্গাবে আর ভস্ম হ'য়ে যাব। তুমি অল্প মাত্র তপস্যা করিয়াছ এবং তাহাতে কিছুমাত্র শক্তি সংগ্রহ করিয়াছ এবং তাহা অপব্যয় করায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে এখন কিছুদিন তীর্থস্থলে যাইয়া তপস্যা কর এবং তুমি যে একজন বড় সাধু হইয়াছ, এই ভাবটা মন থেকে তাড়াইয়া দাও।"

গৃহকর্ত্রীর এই সকল কথা শুনিয়া সাধুটি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গৃহে থাকিয়া এবং

গৃহস্থ ধর্ম পালন করিয়া কি করিয়া এই সকল কথা জানিতে পারিলেন, আপনি যে সমস্ত কথা বলিলেন তাহা অতি সত্য। আমি তপোবনে কয়েক বৎসর তপস্যা করিলাম এবং শক্তি হইয়াছে কি না জানিবার জন্য মন বড় চঞ্চল হইল এবং মনে হইল একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আমি যে বৃক্ষের তলায় বসিয়া তপস্যা করিতাম, একদিন সেই বৃক্ষের উপর একটা কাক ও একটা বক আসিয়া বসিল। সেই বৃক্ষের উপর হইতে কাক ও বক বিষ্ঠা ত্যাগ করিল এবং তাহা আমার গায়ে পড়িল এবং ক্রোধবশতঃ তাহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্র তাহারা ভস্ম হইয়া মাটিতে পড়িল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে বড় উল্লাস হইল এবং ভাবিলাম আমার তপস্যা শেষ হইয়াছে, তপস্যার আর আবশ্যক নাই। এক্ষণে আমি দেশভ্রমণে বাহির হইব এবং যাহারা আমার উপযুক্ত সম্মান করিতে অবহেলা করিবে, তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিব, এমন কি ভস্ম করিব। আমার এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইবে, আমার খুব যশ ও প্রতিষ্ঠা হইবে।

কিন্তু আপনি স্ত্রীলোক, গৃহস্থালীর কার্য করিয়া থাকেন, কখনও তপোবনে যান নাই এবং কঠোর তপস্যাও করেন নাই, তবে আপনি কি করিয়া আমার সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন?" তখন গৃহকর্ত্রী শান্তভাবে সেই সাধুটিকে বুঝাইতে লাগিলেন, "আমিও খুব তপস্যা করিয়া থাকি, আপনি সাধু, অরণ্যে গিয়া তপস্যা করেন, আমি গৃহী গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সেইরূপই তপস্যা করি, ইহা কোন অংশে ন্যূন নহে। আমার স্বামী পঙ্গু, চলচ্ছক্তিরহিত এবং বৃদ্ধও হইয়াছেন। আমি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করি; কি প্রকারে তিনি সুস্থ থাকেন এবং কিসে তিনি সন্তুষ্ট হন, এই বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করি। তাঁহাকে স্নান করাইয়া মধ্যাহ্নে তাঁহাকে আহার করাইয়া থাকি এবং তারপর নিজে আহার করি। রাত্রিতে তাঁহার শুশ্রূষা করি, অন্য কোন দিকে আমার মন যায় না,

ঘুমাইবারও সময় থাকে না। এই একনিষ্ঠ হইয়া পতিসেবা করি বলিয়াই আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। আমার তীর্থ পর্যটন বা অরণ্যে তপস্যা করার কোন প্রয়োজন নাই। আমি আমার নিজ গৃহেই তপস্যা করি এবং স্বামীই আমার পরম আরাধ্য।"

সাধুটি তখন বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি ধর্মবিষয়ে উচ্চ কথা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাকে সকল কথা বলুন।" গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "আমার এখন স্বামী সেবা করিবার সময়, অধিক কথা কহিবার সময় নাই, যদি বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে অমুক স্থানে ধর্ম-ব্যাধ নামে এক মাংস-বিক্রেতা আছেন, তাঁহার নিকট যান, তিনি আপনাকে অনেক উচ্চ অবস্থার কথা বলিবেন।"

সাধুটি ভাবিলেন—আমি এতদিন অরণ্যে তপস্যা করিয়া শেষে এক মাংসবিক্রেতার নিকট ধর্ম শিক্ষা করিতে যাইব? কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল যে, গৃহকর্ত্রী এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা অন্যায়। তিনি অগত্যা ধর্ম-ব্যাধের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

কিছুদিন হাঁটিয়া সেই ধর্ম-ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, ধর্ম-ব্যাধ হাটে মাংস বিক্রয় করিতেছেন। সাধুটি তাঁহার নিকট নিজ পরিচয় দিলে, ধর্ম-ব্যাধ বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার কার্য সমাপ্ত করিতে দিন এবং পরে গৃহে যাইয়া সুস্থ হইয়া ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিব।" সাধুটি অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। ব্যাধ বলিতে লাগিলেন, "আমার অন্য কোন প্রকার তপস্যা নাই, আমি গৃহস্থ আশ্রমে থাকি এবং যতদূর সম্ভব গৃহস্থের ন্যায় কার্য করিয়া থাকি এবং ইহাই আমার তপস্যা। আমার বৃদ্ধ পিতামাতা আছেন। আমি প্রাতে উভয়কেই প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে শুশ্রূষা করিয়া থাকি, তারপর স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন ও অভ্যাগতদের আহারের সংস্থান করিয়া নিজকার্যে গমন করিয়া থাকি, কিন্তু মাংস-বিক্রয়কালে কোন প্রকার প্রবঞ্চনা করি না।

সকলকেই ন্যায্য মূল্যে মাংস দিয়া থাকি, এইজন্য সকলেই আমার উপর তুষ্ট। মধ্যাহ্নে গৃহে আসিয়া পিতামাতাকে স্নান ও আহার করাই, তাহার পর সন্তানসন্ততি ও অতিথিদিগকে আহার করাই এবং সকলের শেষে আহার করিয়া থাকি এবং রাত্রিতেও ঐরূপই করি। আমার স্ত্রীকে সাধ্বী বলিয়া জানি, তাহার প্রতি কখনও রূঢ় ব্যবহার করি না, তাহাকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করিয়া থাকি। এইসকল কার্যের দরুণ আমার ভিতর এক নূতন দৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই শক্তির বলে আমি অশিক্ষিত হইলেও, নানাশাস্ত্র আমার কণ্ঠে আসিয়া আবির্ভূত হয়। এই সমস্ত ব্যতীত অন্য তপস্যা করি না।"

তখন সাধুটি ধর্ম-ব্যাধকে ধর্ম মার্গের উচ্চাঙ্গের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম-ব্যাধও যথাযথ সন্তোষজনক উত্তর দিতে লাগিলেন। সাধুটি সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। এই উপাখ্যানটি শেষ হইলে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "Every one is great in his own sphere, অর্থাৎ সাধু, সাধুনিয়মে যদি ঠিক ঠিক চলে, তবে উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারে। গৃহস্থ যদি গৃহস্থাশ্রমে ঠিক ঠিক চলে, সেও উচ্চ অবস্থা লাভ করিবে। কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট নহে। উভয় আশ্রমই সাধনের মার্গ। কেবল উপায় ও নিয়মাবলী ভিন্ন ভিন্ন। এক যদি অপরকে আপনার চেয়ে হীন বা শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহা হইলে সে ভ্রান্ত, আশ্রমের ঠিক উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই। সকলেরই সমান অধিকার।"

এক ত্যাগী সাধুর কথা—স্বামিজী একদিন রাত্রে এক ত্যাগী সাধুর উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন, "এক দেশে এক রাজকন্যার স্বয়ম্বর হইবে। এদেশে যেমন Beauty show হয় অর্থাৎ দেশের সুশ্রী কন্যাদের একত্র করা হয় এবং তাহাদের কে সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, কে দ্বিতীয় সুশ্রী, কে তৃতীয় সুশ্রী নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এ প্রথা নাই। তদ্দেশে স্বয়ম্বর ভিন্ন প্রথা।

অনেক রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহারা এক বিশেষ দিনে সকলে সমবেত হয় এবং একটা খুব বড় সভার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে যে যাহার বীরত্বের পরিচয় দেয়। রাজকন্যাকে নানা অলঙ্কারে ও বেশভূষায় ভূষিত করাইয়া এক সিংহাসনে বসাইয়া কাঁধে করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করান হয় এবং ভাট (Herald) প্রত্যেক রাজার নাম উল্লেখ করিয়া তার বংশ ও গুণের পরিচয় দেয়। রাজকন্যা তাহাদিগের ভিতর একজনকে মনোনীত করিয়া বিবাহ করে। ইহাই হইতেছে সাধারণ প্রথা।

এই উপাখ্যান-বর্ণিত সেই রাজকন্যাকে সভামণ্ডপে আনয়ন করা হইল এবং ভাট (Herald) এক একজন রাজার নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ করিতে লাগিল, প্রথম ব্যক্তি রাজকন্যার মনোনীত হইল না, তখন সিংহাসন অপর এক রাজার নিকট আনয়ন ও স্থাপন করা হইল এবং তাহার গুণকীর্তন হইল, রাজপুত্রী তাহাকেও মনোনীত করিল না। ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট আনয়ন করিয়া গুণকীর্তন হইল, কিন্তু রাজকন্যা কাহাকেও মনোনীত করিল না।

ঘটনাক্রমে এক সাধু সেই নগর দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি শুনিলেন যে, মহাসমারোহ করিয়া এক উৎসব হইবে এবং রাজ-কন্যার বিবাহ হইবে। কৌতূহলবশতঃ তিনি সেই উৎসব দেখিবার জন্য সভায় উপস্থিত হইলেন এবং এক নিভৃতস্থানে বসিয়া রহিলেন। রাজা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি অপুত্রক, কেবলমাত্র একটি কন্যা আছে, কন্যা যাহাকেই মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবে, রাজা তাহাকেই সমস্ত রাজ্য দিয়া অরণ্যে গিয়া তপস্যা করিবেন এবং সেই ব্যক্তি রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া রাজত্ব করিবেন।

রাজপুত্রীর সিংহাসন যখন সাধুর কাছে আসিল এবং সে সেই সাধুকে মনোনীত করিল, তখন সাধু অন্তরে বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তিনি ত্যাগী, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন. সংসারের কোন বন্ধনে তিনি থাকিবেন না, রাজপুত্রী সিংহাসনে তাঁহার নিকটে আসিয়া

তাঁহাকেই মনোনীত করিল দেখিয়া সাধুটি সভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। বাহকেরাও রাজপুত্রীকে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। তিনি নগর, গ্রাম, প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রাজপুত্রীর সিংহাসনও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সাধু পিছন ফিরিয়া রাজপুত্রীকে বলিলেন, 'দেখুন, আপনি ভুল পথ অবলম্বন করিতেছেন। আমি সাধু, সর্বত্যাগী, তরুমূল আমার বাসস্থান, আপনি আমায় মনোনীত করিয়া অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। আমি সন্ন্যাস আশ্রমে থাকি, তাহার নিয়ম পালন করি। ঐশ্বর্য, রাজ্য, সম্পদ, মান, যশ আমার পক্ষে অতি তুচ্ছ জিনিস, এই সমস্ত দ্রব্যে আমার কোন স্পৃহা নাই। আপনি রাজপুত্রী, গৃহস্থ আশ্রমের লোক, আপনি গৃহস্থ আশ্রমে থাকুন, তাহাতেই আপনার মঙ্গল হইবে। একের অন্যের আশ্রমে যাওয়া অবিধেয়। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি গৃহস্থ আশ্রমের নিয়ম প্রতিপালন করুন। এই বলিয়া সাধুটি নিজের গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন।"

এই উপাখ্যানটি বলিয়া স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে এই সাধুটির ঠিক ঠিক ত্যাগের শক্তি (Spirit of renunciation) হইয়াছিল। জগৎ তাহার কাছে তুচ্ছ, ব্রহ্ম তাহার কাছে একমাত্র ধ্যেয় বস্তু।

সখ্যভাব—ভক্তির বিষয়ে বক্তৃতাকালে সখ্যভাবের কথা উঠিল। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, সখ্যভাব ভারতবর্ষেও আছে। ভগবানকে আত্মসখা বলিয়া সাধনা করা শুধু হিন্দুদেরই ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়, অপর ধর্মের ভিতর ইহা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, বা থাকিলেও প্রচলিত নয়। ভগবানকে সখা ভাবে সাধনা করিলে বুকে বেশ জোর আসে এবং অনেকের পক্ষে ইহা বিশেষ মঙ্গলকর।

প্রভু-ভাব—অনেক ধর্মেতেই ভগবানকে প্রভু বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছে। প্রভুর আদেশ প্রতিপালন কর এবং তাঁহার নিকট সংযত হইয়া থাক। ইহাও একপ্রকার ভক্তিভাব। অনেক ধর্মে এবং সাধারণ লোকের মধ্যে এই প্রভু ভাবটি প্রচলিত। ইহাতেও অনেকের মঙ্গল হয়।

অ-বিভক্ত (Individuality)—একদিন রাত্রের বক্তৃতায় কথা উঠিল যে, লোকে সাধারণ কথায় বলিয়া থাকে—He is a man of strong individuality এবং প্রত্যেক লোকই এক একটি অ-বিভক্ত বা individual। ইহার অর্থ কি? Individual মানে অ-বিভক্ত। একমাত্র ব্রহ্মই অ-বিভক্ত, আর জগতের প্রত্যেক বস্তুই বিভক্ত ও পরিবর্তনশীল। আমরা অনবরত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতেছি, স্থির বা সাম্য অবস্থায় আসিতে পারিতেছি না। তবুও আমরা সর্বদাই আপনাকে অ-বিভক্ত বা individual বলিয়া জানিতেছি এবং সেইটাই আমাদের প্রত্যেকের ধারণা। আমাদের দেহ পরিবর্তনশীল, আমাদের আনুসঙ্গিক অবস্থা পরিবর্তনশীল, আমাদের মন পরিবর্তনশীল, সেইজন্য বিভক্ত। কিন্তু এই পরিবর্তনের ভিতরেও নিজেকে অ-বিভক্ত বলিয়া জানি। এইটাই স্থির জ্ঞান। অহং যে প্রকৃতই অ-বিভক্ত—এই জ্ঞান ভিতরেও রহিয়াছে, সেইজন্য আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের ভিতরেও নিজেকে অপরিবর্তনশীল বলিয়া জানি। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকে এখনও অ-বিভক্ত বা individual হয় নাই, কিন্তু পরিবর্তন সকল অতিক্রম করিয়া অ-বিভক্ত বা individual হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে অ-বিভক্ত বা individual হইবে।

শ্রদ্ধা (Personal attachment)—ধর্মজীবনে উন্নতি করিতে হইলে কোন ব্যক্তি বা ইষ্টের প্রতি অনুরাগ বা personal attachment অতিশয় প্রয়োজন। ভক্তিমার্গের সমস্ত পথটাই এই নিষ্ঠা বা আন্তরিক অনুরাগের উপর নির্ভর করিতেছে। ইষ্টের প্রতি যাহার যে পরিমাণে নিষ্ঠা হইবে, তাহার সেই পরিমাণে সান্নিধ্যজ্ঞান

হইবে। এই নিষ্ঠাই ভক্তের মনকে স্তরে স্তরে উচ্চমার্গে লইয়া যাইবে। উদাহরণ স্বরূপ স্বামিজী বলিতে লাগিলেন "আমি বক্তৃতা করিতেছি এবং এত লোক সমাগম হইতেছে, কিন্তু যাহার যে পরিমাণে নিষ্ঠা বা personal attachment হইবে, তিনি সেই পরিমাণে জিনিসটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাহার ভিতর সেই পরিমাণে জিনিসটি প্রতিবিম্বিত হইবে। এই নিষ্ঠাই হইল মূল জিনিস। যাহার বক্তার উপদেশের উপর শ্রদ্ধা নাই, তাহার পক্ষে বক্তৃতা তত ফলদায়ক হয় না। স্ত্রীর স্বামীর উপর শ্রদ্ধা আছে, সেইজন্যই তাহাদের সংসার এত পবিত্র, এত মধুর। ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা প্রথমে একেবারেই হয় না, কিন্তু সামান্য দিন কতক চেষ্টা করিলে পথটা খুলিয়া যায় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।" স্বামিজী এই নিষ্ঠার বিষয় অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রগাঢ় আন্তরিক ভক্তি সেইসময় সকলের ভিতর জাগ্রত হইয়াছিল। একটি আত্মগোষ্ঠি ভাব বেশ টের পাওয়া গেল। প্রত্যেক শ্রোতার মনই যেন স্বামিজীর মনের সহিত মিশিয়া যাইয়া সেই ভাবে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

ভাব-দর্শন—দেহ হইতেছে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি, স্পন্দন তাহা পরিচালিত করিতেছে। এই স্পন্দন স্থূল পদার্থের উপর হইতেছে, সেইজন্য আমরা সূক্ষ্ম বস্তু সকল দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু যখন স্থূল পদার্থ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম পদার্থের দিকে অগ্রসর হই, তখন সেই স্পন্দন অন্যপ্রকার বস্তু সৃষ্টি করে। মন জিনিসটি হইতেছে ভাবের সমষ্টি বা a bundle of ideas। এই ভাব সকলকে প্রথমে আমরা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু যখন আমরা সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হই, তখন সেই স্পন্দন সূক্ষ্ম ভাবকে রূপ ও বর্ণ (form and colour) আনিয়া দেয়। সবই স্পন্দনের সৃষ্টি। এই রূপ ও বর্ণ-সংযুক্ত ভাবসকল প্রথমে অস্পষ্ট অবস্থায় থাকে এবং ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া সুস্পষ্ট হয়। ইহাকে অধ্যাস বা self-projection বলে অর্থাৎ

ভিতরের ভাবরাশি প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। ভিতরকার শক্তি বা সূক্ষ্ম স্পন্দন যে পরিমাণে যতক্ষণ থাকিবে, এই রূপাবিষ্ট ভাবও ততক্ষণ থাকিবে এবং ভিতরকার শক্তি বা স্পন্দন হ্রাস হইলে সম্মুখের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ভাবটিও কমিয়া যাইবে। আমি ভাবকে প্রত্যক্ষ করিলে, তবে বিশেষ কিছু বলিতে পারি। ভাব বা Idea যে পরিমাণে মনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, আমার বক্তৃতাও সেই পরিমাণে শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। আমি শুধু ভাবটাকে চক্ষের উপর দেখি আর বলিয়া যাই। এই ভাব-দর্শন বা visualisation of ideas সম্বন্ধে তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

পুনর্জন্ম—আমাদের মন সর্বদাই বহির্মুখী। শক্তির গতিই হইতেছে অন্তর হইতে বাহিরে দিকে চলিয়া যাওয়া। নূতন জিনিস গ্রহণ করিব, ইহাই মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং মন এইদিকেই ধাবিত হইতেছে। এইজন্য মানুষ নূতন জিনিস আবিষ্কার করিতেছে। কিন্তু মনের অপর আর একটি গতিও আছে, ইহা অন্তর্মুখী অর্থাৎ মনটিকে পিছন দিকে ফিরাইয়া দেওয়া। সাধারণ লোকের অতীতের কার্যের কথা স্মরণ থাকে না। যদি একজন সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, দুইচারদিন পূর্বে সে কি কি কাজ করিয়াছে, কাহার সহিত কি কি কথাবার্তা কহিয়াছে, তাহা হইলে সে প্রায়ই উত্তর দিতে পারে না। তাহার স্মরণ-শক্তিতে সেইসমস্ত কার্যাবলী উদয় হয় না, হয়ত কষ্ট-কল্পনা করিয়া কিছু সামান্য বলিতে পারে। কিন্তু একপ্রকার প্রক্রিয়া আছে, যদ্দ্বারা পশ্চাতের সমস্ত ঘটনা অনেক পরিমাণে জাগ্রত করা যাইতে পারে। প্রথমে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতে হয়, সেইদিন প্রাতে কি কি কাজ করিয়াছি, কাহার সহিত কি কি কথাবার্তা কহিয়াছি, তাহার পর চিন্তা করিতে হয় পূর্বদিন কি কি কার্য করিয়াছি, কোথায় যাওয়া আসা করিয়াছি ইত্যাদি। এইরূপভাবে ক্রমশঃ একটি একটি করিয়া

পশ্চাৎদিকে হাঁটিয়া যাইতে হয় ও সেইদিনকার সমস্ত কার্য নিবিষ্ট মনে ভাবিতে হয় এবং সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত করিতে হয়। প্রথম প্রথম ইহা বড় কষ্টদায়ক ও বিরক্তিকর, কিন্তু অল্পদিন এই প্রক্রিয়া অভ্যাস করিলে মন দৃঢ় হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে পশ্চাৎদিকে ভাবিতে ভাবিতে শেষে শৈশবকাল সম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তা করিতে হয়। সেই শৈশবকালে কাহার সহিত খেলাধুলা করিয়াছি, কাহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছি এবং কে কে স্নেহ করিত ইত্যাদি সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জাগ্রত করিতে হয়। তাহার পর একস্থানে চিন্তাশক্তি বদ্ধ হইয়া যায়, আর যেন পশ্চাৎদিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সেই রেখা যদি কেহ অতিক্রম করিতে পারে, তাহা হইলে সাম্য অবস্থায় যাইতে পারে। তথা হইতে আরও পশ্চাৎদিকে গমন করিলে প্রাণ অবস্থাতেও যাইতে পারে এবং তাহা হইলে পূর্বজন্মের সমস্ত কথা মানুষ জানিতে পারে। সেই শেষোক্ত কথাগুলি শাস্ত্রে লিখিত আছে এবং ইহা সত্য বলিয়া আমার ধারণা। আমি নিজে যতটা করিয়াছি এবং মনের পশ্চাৎদিকে গতি করিয়া যতদূর উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাতে এই সকল বিষয় সত্য বলিয়া বোধ হয়। সেইদিন স্বামিজী নানাগ্রন্থ হইতে উক্ত বিষয় উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া অতি সুন্দরভাবে দিয়াছিলেন।

সাধনার প্রথম অবস্থা—মন প্রথম সংযত করিবার সময়ে অনেক রকম বিভিন্নমুখী চিন্তা আসে। সেইগুলিকে প্রথম দৌড়াইতে দেওয়া ভাল। তাহাদের যতটা শক্তি আছে সেইটি নিঃশেষিত হইলে, তাহারা আপনা আপনি স্থির হইয়া যায়। তারপর গা চুলকাইতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ কিল্‌বিল্ করিয়া কি যেন ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও বা পিঁপড়ার মত সুড়সুড়ি দিয়া থাকে। এ সমস্ত সাধনার প্রথম অবস্থার কথা। তাহার পর মাথার পিছন দিকটা গরম হইয়া উঠে এবং একটা যন্ত্রণা বোধ হয়। যখন এরূপ অবস্থা

আসিবে, তখন ধ্যান বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল। জোর করিয়া বেশীক্ষণ ধ্যান করিলে বিশেষ ফল হয় না, বরং কার্য পিছনে পড়িয়া যায় অর্থাৎ শরীরের যতটা শক্তি সে সময় জাগ্রত হইয়াছে, তাহা কমিয়া আসিতেছে—এইজন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ। কখনও বা পিঠের মেরুদণ্ডের ভিতর সরু ছুঁচ ফুটাইয়া দিতেছে এরূপ বোধ হইবে। তখন আর ধ্যান করা উচিত নয়। কারণ তখন স্নায়ুসকল একটু বিশ্রাম পাইলে পুনরায় সবল ও সতেজ হইয়া উঠে এবং পুনরায় বেশ ধ্যান করিবার শক্তি হয়। এইসময় খুব প্রস্রাব হইয়া থাকে, ইহা পীড়ার লক্ষণ নয়, প্রস্রাব হইয়া গেলে শরীর কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থ হয়। কখনও মনকে প্রচলিত অবস্থা হইতে ঊর্ধ্বে লইয়া যাইবার সময় শরীরের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

*[মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডের ভিতর এক প্রকার সূক্ষ্ম ধূসর পদার্থ (greyish substance) থাকে, তাহাকে গ্যাংগ্লীয়নিক কোষ (ganglionic cell) বলে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে অনেকটা বাঙ্গলা (৫) পাঁচের মত দেখায়। অনেকক্ষণ এক বিষয় চিন্তা করিলে মস্তিষ্কে ও কিয়ৎ পরিমাণে মেরুদণ্ডের ভিতরের গ্যাংগ্লীয়নিক কোষগুলি ফাটিয়া যায়। তাহা হইতে যে শক্তি বাহির হয়, তাহাই চিন্তা-শক্তি। সেইজন্য শরীরে, বিশেষতঃ মস্তিষ্কে একটা উত্তাপ অনুভব হয় এবং গাত্রে কি যেন চলা-ফেরা করিতেছে, এইরূপ টের পাওয়া যায়। এই কোষগুলি যখন অনেক পরিমাণে ফাটিয়া যায় বা মৃত কোষগুলি যখন বহির্গমন করিবার চেষ্টা করে, সেই সময় খুব প্রস্রাব হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল তৃষ্ণা হয়। এইজন্য অনেকক্ষণ ধ্যান বা চিন্তা করিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে অর্থাৎ মস্তিষ্ক প্রথম অবস্থাতে কিঞ্চিৎ দুর্বল হইয়া যায় এবং পিপাসা অধিক হয়। এই প্রথম অবস্থাতেই শরীরে বহুপ্রকার পরিবর্তন ঘটে, কখন বা ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, কখন বা ক্ষুধামান্দ্য হয়, ইত্যাদি নানাপ্রকার শরীরে ব্যতিক্রম

লক্ষিত হয়। ইহা কোনরূপ পীড়া নহে। কিন্তু কতকগুলি নূতন স্নায়ু জাগ্রত হয় বলিয়া ঐরূপ হইয়া থাকে।]*

মনকে ছাড়িয়া দাও—মনকে চিন্তা করিতে দাও। প্রথম মনকে স্থির করিতে গেলেই অসংবদ্ধ চিন্তা আসিবে। অল্পদিন পরে আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ক্রমেই ধীরে ধীরে স্থিরভাব আসিবে। প্রথম অবস্থায় মনের চিন্তাস্রোতকে জোর করিয়া বন্ধ করিবার আবশ্যক নাই। তাহাকে যতদূর দৌড়াইতে পারে, দৌড়াইতে দাও, তারপর আপনিই নিস্তেজ হইয়া আসিবে। তখন কার্যের সুবিধা হবে।

[কতকগুলি স্নায়ু-সমষ্টি (bundle of nerves) এক সঙ্গে উত্তেজিত হয়। সেই স্নায়ু-সমষ্টির প্রত্যেকটি দিয়া চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, এইজন্য নানাপ্রকার বীভৎস ও অসংবদ্ধ চিন্তা হয়। প্রত্যেক স্নায়ু একটিমাত্র ভাব বহন করে। আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের দেহধারণের চিহ্নস্বরূপ স্নায়ুমাত্র রহিয়াছে। যদিও আমাদের বাহ্যিক অবয়ব পরিবর্তিত হইয়াছে, তথাপি পূর্ব পূর্ব জন্মের স্নায়ু সকল এই দেহমধ্যে আছে। সেইজন্য মনকে স্থির করিতে যাইলে বা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলে, সেই পুরাতন স্নায়ুসকল হঠাৎ জাগ্রত হইয়া যায়। সাধারণ অবস্থায় তাহাদের জানিবার বা বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তখন তাহারা সুষুপ্ত থাকে, কিন্তু মনকে অন্তর্মুখী-গতি করিলেই সেই সুষুপ্ত স্নায়ুসকল জাগ্রত হইয়া উঠে এবং সেইজন্য বীভৎস চিন্তা উদিত হয়। এস্থলে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব পূর্ব জন্মে আমরা কিরূপ দেহ ধারণ করিয়া ছিলাম, তাহার আভাসও এইসময় পাওয়া যায়। কারণ এইসময়ের অনেক চিন্তা মনুষ্যের উপযোগী নহে, নিম্ন প্রাণীর উপযোগী।]

চিত্ত সংলগ্ন হওয়া—মনকে কোন ধ্যেয় বস্তুর উপর সংলগ্ন

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

করিতে হয়; অন্য সকল বস্তু ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র একটি লক্ষ্যের উপর চিত্ত নিবিষ্ট করিতে হয়। কেহ বা হৃদয়পদ্মে মন সংলগ্ন করেন, কেহ বা অপর পদ্মেও মন সংলগ্ন করেন। প্রত্যাহার অর্থ মনকে জড়বস্তু বা ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু হইতে পৃথক করিয়া লওয়া। কিন্তু এইরূপ পৃথক করিয়া লইলে অধিককাল মন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

সর্ব-ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তু হইতে মনকে তুলিয়া লওয়া শক্তির ক্রিয়া বটে, কিন্তু ইহা negative process। এই negtive process'এ মন অনেকক্ষণ থাকিতে পারে না। কারণ মনের positive বা active process একটা আবশ্যক। positive কোন বস্তুর উপর সংলগ্ন করা প্রয়োজন, এইজন্য হৃদয়পদ্মে বা অন্য কোন পদ্মে সংলগ্ন করিতে হয়। ভক্তিমার্গের লোক কোন ইষ্টের চিন্তা করিয়া থাকে। ইষ্টের অবয়ব আছে ও নিজের ইচ্ছানুযায়ী ইষ্টের বর্ণ ও অন্য সকল গুণ আছে। কেহ কেহ বা অবয়ব পরিত্যাগ করিয়া এক বিন্দুর উপর মনঃসংযোগ করেন। যাহা হউক, কোন একটা positive বস্তুর উপর মন সংলগ্ন করিতে হয়। মনকে অন্তর্মুখী করিবার সময়ে প্রথমে যদিও শরীরে গ্লানি বা চাঞ্চল্যভাব আসে, কিন্তু একবার অন্তর্মুখী ভাব হইলে তখন নূতন রকম ভাব আসে। শরীরের চর্ম ও তৎসান্নিধ্য স্থানে যে উত্তাপ আছে, আমরা সাধারণতঃ তাহা বুঝিতে পারি না। কারণ, এইটাই হইতেছে সাধারণ অবস্থা। মন অন্তর্মুখী হইলে স্নায়ুর এই উত্তাপ নিম্নস্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় এই উত্তাপস্রোত যেরূপভাবে শরীরের গভীর স্তরে প্রবেশ করিবে, মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপভাবে পরিবর্তিত হইবে। এইজন্য শরীর হাল্‌কা বলিয়া বোধ হয় এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত হইয়া থাকে। কিছুদিন অভ্যাস করিলে হাতের নাড়ীর যে তীব্র গতি আছে তাহা শ্লথ বা কম পরিমাণ হইয়া যায়। ইহা কোন পীড়ার কারণ নহে

অর্থাৎ নাড়ীর স্পন্দন এত দ্রুত না হইয়া কম পরিমাণে হয়। নানারকম বিপরীত চিন্তা ও বহির্মুখী শক্তি গমনেতে সর্বদাই শরীরের ক্ষয় হইতেছে; এইজন্য আমাদের আহার, পানীয় প্রভৃতি এত আবশ্যক হয়। কিন্তু শক্তি যখন অন্তর্মুখী হয়, তখন শরীরের ক্ষয় অনেক পরিমাণে অল্প হয়। আভ্যন্তরিক শক্তি সংরক্ষিত হয়, শরীরকে এই শক্তি পুষ্ট রাখিতে পারে। এইজন্য আহারের পরিমাণ কমিয়া আসে। কোন কোন দার্শনিকের এইরূপ মত আছে যে, বিপরীত চিন্তার দ্বারা শরীরের যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা অন্তর্মুখী শক্তির দ্বারা নিবারণ করিলে আভ্যন্তরিক শক্তির দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারে। বাহ্যিক জড়-আহারের তত প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদের এই মত যে বায়ুর সহিত যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, অন্তর্মুখী শক্তি বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত হইলে এই বায়ুর সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা শরীর রক্ষা হইতে পারে। পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অনেক তপস্বীর এইরূপভাবে জীবিত থাকার উদাহরণ পাওয়া যায়। কারণ, শরীরের সমস্ত স্নায়ুর গতি অন্য প্রকারে চলে, এইজন্য স্থুল বস্তুর তত প্রয়োজন হয় না।

চিন্তা করিবার নিয়ম—চিন্তা করিবার সময়ে সেইভাবে তন্ময় হইয়া যাইবে। অসংবদ্ধ চিন্তা করিলে কোন ফল হয় না। চিন্তা-স্রোত প্রত্যেকে এমন ভাবে আনয়ন করিবে যেন সেই ভাবেতে পরিপূর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ তন্ময় হইয়া যাইবে। সেই চিন্তার যখন যেদিকে স্রোত বহিবে সেই দিকে খুব তেজে চলিবে, সেই কার্য খুব সফল হইবে।

* [Think not through your brain alone but through your nerves. এক একটি স্নায়ু দিয়া এক একটি ভাব প্রবাহিত হয়। সেই ভাব এক স্নায়ু হইতে অপর স্নায়ুতে সঞ্চারিত হয় এবং পরে সর্ব দেহেতে পরিব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ তন্ময় হয়। তখন অন্য চিন্তা আর বিশেষ করিতে পারে না। একটি মাত্র চিন্তারই

আধিক্য হয়। সেই চিন্তা যেদিকে প্রবাহিত হইবে, তখনই তাহা সফল হইবে।] *

শক্তির গতি—স্বামিজী অনেক স্থলে এই কথাটি বলিয়াছিলেন যে যদি একটি ঢিল বা পাথর ছোঁড়া যায় এবং লোকটি যদি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে সেই ঢিলটি বা পাথরটি পুনরায় সেই ব্যক্তিটির হাতে ফিরিয়া আসিবে। পথিমধ্যে যদি কোন অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক পাথরটির বা ঢিলটির গতিরোধ না করে তাহা হইলে সেই ভ্রাম্যমান প্রস্তরখণ্ড নিশ্চয়ই হাতে আসিবে। এই উপমাটি তাঁহার বিশেষ উদাহরণ ছিল। যেমন বালকদিগের ইউক্লিডের সরল রেখা (straight line) জ্ঞান। তাহাদের ধারণা যে, সব জিনিস সরল রেখাতে হয় এবং সেইজন্য তর্ককালে তাহারা বিশেষ গোলযোগ করে। কিন্তু শক্তির গতি ঠিক সরলরেখার নয় ইহা circle বা বর্তুলাকার হয়। আরও নিশ্চিত করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইহা curvature বা বক্ররেখা, ঠিক circle বা বর্ত্তুলাকার হয় না কিন্তু elipse হয়। সরল রেখা হইতেছে shortest part of a curvature। এই সরল রেখা ও বৃত্তের ভাবটি বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করা আবশ্যক।

বিদেহ হওয়া—স্বামিজী বিদেহ অবস্থা বা incorporeal state এই ভাবটির উপর বিশেষ জোর দিতেন। এই বিদেহ অবস্থা না হইলে উচ্চ চিন্তা করা যায় না। চিন্তা যত উত্তরোত্তর স্থূল হইতে সূক্ষ্মদিকে ধাবিত হইবে, মনও তত ধীরে ধীরে বিদেহ অবস্থাতে যাইবে। বিদেহ অবস্থা হইবার স্বামিজী একটি নিয়ম বলিয়াছিলেন। ধ্যানে একটু অভ্যস্থ হইলে অর্থাৎ প্রথমকার অন্তরায় সকল চলিয়া যাইলে মনে করিবে যে নিজে দুইটি হইয়া বসিয়া আছ। নিজে বসিয়া ধ্যান করিতেছ এবং ঠিক সামনে নিজেই

---

* টীকা।—গ্রন্থকার।

বসিয়া আছ এবং পরস্পরে মুখের দিকে চাহিয়া আছ। এই ভাবে কিছুদিন ধ্যান করিলে মনটা স্থূল-দেহ হইতে সম্মুখস্থিত সূক্ষ্ম দেহতে চলিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে বিদেহ অবস্থায় আইসে।

আর একটি উপায় তিনি বলিতেন। মনে কর নিজের দেহটি মরিয়া পড়িয়া আছে এবং নিজেই বসিয়া নিজের মৃত দেহকে স্থির হইয়া দেখিতেছ। এরূপ চিন্তা করিলেও বিদেহ অবস্থায় আসা যায়। স্বামিজী পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে, এ সকল জিনিস পড়িবার বা শুনিবার কথা নয়, রীতিমত সাধনা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। One ounce of practice is better than a ton of big talk অর্থাৎ এক ছটাক সাধনা তিরিশ মণ লম্বা বচনের চেয়েও ঢের বেশী কার্য করে।

স্নায়ু সংযত করা—স্বামিজী এই কথাটি প্রায় বলিতেন যে, যিনি যে পরিমাণে শরীরে স্নায়ুকে আয়ত্তাধীন করিবেন অর্থাৎ ইচ্ছামত তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে আত্মাকে শরীরের (মাংসের) বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। যোগীরা অভ্যাস বা সাধনা করিয়া শরীরের অনেক স্নায়ুকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে পারেন। হৃদ্‌পিণ্ড যে স্বাভাবিক স্পন্দন করিতেছে, এবং যে রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত করিতেছে, যোগী ইচ্ছা করিলে সেই হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারেন আবার অনেক স্নায়ুর ক্রিয়া তাঁহারা ইচ্ছামত চালাইতে পারেন। ইউরোপীয় মতে প্রত্যেকগুলি (automatic). আমরা ইচ্ছা করি বা না করি স্বভাবতঃ তাহাদের ক্রিয়া চলিতেছে কিন্তু যোগীরা এই মত পোষণ করেন না। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক স্নায়ুকে আয়ত্তাধীন করা যাইতে পারে।

জপধ্যান করিবার সময় মনে নানারকম বীভৎস ও বিপরীত চিন্তা উদয় হয়। বীভৎস চিন্তা চলিয়া গেলেও বিপরীত দ্বন্দ্ব-চিন্তা বহুকাল থাকে। কিন্তু যে মন চিন্তা করিতেছে সেইটা চঞ্চলপ্রকৃতি,

তার স্থায়িত্ব কিছু নাই, সে অপরিবর্তনীয় আত্মা নহে। এইজন্য চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হয় বা চিন্তাস্রোতকে একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে আত্মদর্শন হয় বা আত্মোপলব্ধি হয়। এই কার্যটি হঠাৎ যেন কেহ না করে। হঠাৎ করিলে বিশেষ পীড়া হয়, এমন কি উন্মাদ পর্যন্ত হইয়া যাইতে পারে। অতি ধীরে ধীরে এই ক্রিয়াটি সাধন করিতে হয়। এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া স্বামিজী বলিতে লাগিলেন।

এই প্রক্রিয়া শুনিতে অতি সহজ কিন্তু করা অতীব দুরূহ। একটু বে-নিয়ম হইলেই উৎকট পীড়া হইতে পারে। কয়েক ব্যক্তি যক্ষ্মাগ্রস্ত ও উন্মাদ হইয়া অবশেষে মরিয়া গিয়াছে। ইহা না করাই শ্রেয়ঃ।

মনকে শূন্য করা—কিছুদিন ধরিয়া একাগ্রমনে জপ-ধ্যান করিলে ভিতরকার কুণ্ডলিনী শক্তি বা ওজস্ জাগ্রত হয়। তখন শরীরের উপর একটা আভা বা আবরণী শক্তি হয়। সাধারণ লোকের গায়ে ইহা কখন কখন লক্ষিত হয়। দুষ্য-প্রবৃত্তি লোকের গায়ে তামস বা কাল রং এর আবরণ পড়িবে। কোন দুষ্য-প্রবৃত্তি লোক আসিলেই দেখা যায় যে তাহার মুখের উপর একটা কাল আভা রহিয়াছে। সৎ ও চিন্তাশীল লোক যখন উচ্চচিন্তা ও জপ-ধ্যান করেন তখন তাহাদের গায়ে এই আবরণী শক্তি শুভ্র বা উজ্জ্বল বর্ণ হইয়া থাকে। বহুকাল ধরিয়া জগৎ এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। মন্দিরে ও তীর্থস্থানে এই শক্তিটি সর্ব স্থানে থাকায় মন্দির বা তীর্থস্থানের সার্থকতা আছে। এই বিষয়টি স্বামিজী নানারূপ উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সকলে স্তম্ভিত ও নিস্তব্ধভাবে সেইসকল বিষয় শুনিতে লাগিল। তখন সকলে বুঝিতে পারিল যে স্বামিজীর দেহ হইতে শুভ্রবর্ণের প্রখর তেজ বাহির হইয়া সকলকে অলক্ষিতভাবে মুগ্ধ করিয়া এক অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করাইয়া দেয়।

মনের আকর্ষণী শক্তি—মন ও কুণ্ডলিনীশক্তি কিছু পরিমাণে উচ্চে গমন করিলে তাহা হইতে এক আকর্ষণী শক্তি বাহির হয়। স্বামিজী নিজেকেই তাহার উদাহরণ ও দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া বলিতেন, "আমি ভিতর হইতে একটা শক্তি জাগ্রত করি, তারপর শ্রোতৃবৃন্দের উপর সেই শক্তিটি ছড়াইয়া দিই। ক্রমশঃ সেই শক্তিটি তাহাদের মনে প্রবেশ করে। তখন আমার নিজের রঙে তাহাদের মন রঞ্জিত করি এবং পরে সেই অনুরঞ্জিত মনগুলিকে আমি নিজের ভিতর আকর্ষণ করিয়া লই। শ্রোতৃবৃন্দের মন ও আমার মন তখন এক হইয়া যায়। শ্রোতৃবৃন্দ আমারি অংশ হইয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকে। আমি সেইসময় যে সকল বিষয় চিন্তা করি, সেইসকল বিষয় ধীরে ধীরে তাহাদের ভিতর প্রবেশ করে ও তাহারা সেইসকল বিষয়ও উপলব্ধি করে।" স্বামিজীর এই উক্তিটি তাঁহার নিজের ভিতরকার পরিচয় দেয়। বহু সংবাদপত্রে যে তাঁহার মহিমময় উপস্থিতি বা majestic presence বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, ইহাই তাহার কারণ। এই উক্তিটি বিশেষ ভাবিবার বিষয়।

আমিই সূর্যতে আমিই চন্দ্রতে—একদিন রাত্রের বক্তৃতাতে আত্মার পরিব্যাপ্তির কথা উঠিল। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, অহং হইতে এই জগৎ আসিতেছে। আমিই সূর্যতে রহিয়াছি, আমিই তারকামণ্ডলীতে রহিয়াছি। আমিই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। অতি বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্রতে আমিই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। সেই দিনকার বক্তৃতাতে স্বামিজী স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইলেন, কণ্ঠস্বর আজ্ঞাপ্রদ, চক্ষু স্থির ও জ্যোতিঃপূর্ণ, যেন নিজের উপলব্ধির কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীকে আত্মার গভীর ধ্যানে চালিত করিতে লাগিলেন। সকলেই সেই বিষয় শুনিতে শুনিতে ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইল। তাঁহার বক্তৃতা শোনা আর ধ্যান করা একই বিষয় ছিল।

ভালবাসা—স্বামিজী ভালবাসার নূতন রকমের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি একটা জিনিসকে ভালবাসি। জিনিসটির আবরণী শক্তির জন্য আমি ভালবাসি না কিন্তু জিনিসটির ভিতর যে আত্মা আছে সেইজন্য আমি ভালবাসি? জিনিসটির ভিতরের আত্মা আমার যে পরিমাণে উপলব্ধি হইবে, আমার ভালবাসাও সেই পরিমাণে বিকাশ হইবে অর্থাৎ আমি যে পরিমাণে আত্মা উপলব্ধি করিতেছি, আমার ভালবাসাও সেই পরিমাণে আসিতেছে। ভালবাসা হইতেছে self emanation বা আত্মপ্রসারনী। আমি বাহিরের চাকচিক্যের জন্য ভালবাসি না কিন্তু তাহার ভিতর যে আত্মা রহিয়াছে সেইজন্য ভালবাসি। যে জিনিসে আত্মা দেখিতে পাই না, সে জিনিস আমি কখন ভালবাসি না, তাহা আমার পক্ষে ত্যজ্য। আত্মা বা ব্যক্তির আত্মার সহিত এক হইতে চেষ্টা করিতেছি। যাহার মন যে পরিমাণে উচ্চ অবস্থায় উঠিয়াছে এবং যে পরিমাণে পরিব্যাপ্ত ভাবে অপর জনের মধ্যে আত্মা দেখিতে পাইতেছে, তাহার ভালবাসা সেই পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। স্বামী যে স্ত্রীকে ভালবাসে, সে স্ত্রীর জন্য নয়, স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, সে স্বামীর জন্য নয়, উভয়ে অজ্ঞাতসারে উভয়ের ভিতর আত্মা উপলব্ধি করে সেইজন্য পরস্পরে পরস্পরকে এত ভালবাসে। There is sacredness even in a secret kiss অর্থাৎ লুক্কায়িত চুম্বনের ভিতরও পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে।

দুঃখের কারণ কি—একজন লোক অপরকে প্রহার করিতেছে বা কষ্ট দিতেছে তাহা দেখিয়া অন্য এক ব্যক্তির মনে কষ্টের উদ্রেক হইতেছে। ইহার কারণ কি? এই বলিয়া স্বামিজী utilitarianদের মত তুলিলেন—pleasure is the end of life, that which we seek is pleasure অর্থাৎ সুখই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং আমরা সুখই অন্বেষণ করিতেছি। যদি এই মতই স্থির হয় তাহা হ'লে আমি অন্যকে কষ্ট দিয়া জিনিস কেন লইব না? অপরের

বিপক্ষ-সাধন করিব না কেন ? ইহাতে ত কোন দোষ নাই। কারণ আমি আমার নিজের সুখ অন্বেষণ করিতেছি ; এইজন্য এই মত যুক্তিসঙ্গত নয়। আমি যে অপরের দুঃখ দেখিয়া কষ্ট অনুভব করিতেছি, ইহার কারণ হইতেছে যে সেই প্রপীড়িত ও আর্ত ব্যক্তির ভিতরও সেই আত্মা রহিয়াছে। নিজের ভিতর যে আত্মা রহিয়াছে তাহা ঐ আর্ত ব্যক্তির আত্মার একধারা (continuation)। একই আত্মার এপিঠ্ ওপিঠ্। সমুদয় জগতই সেই ব্রহ্মের বিকাশ। Vacuum বা ফাঁক বলিয়া কোন পদার্থ নাই। প্রত্যেক বস্তুর সহিত প্রত্যেক বস্তুর সংযোগ। সেইজন্য অপর ব্যক্তির কষ্ট দেখিলে আমার ব্যথা লাগে, অপরের কষ্টতে আমি দুঃখ অনুভব করি। স্বামিজী এইরূপ বলিতে বলিতে একেবারে উর্দ্ধমাত্রায় চলিয়া গেলেন, বিদেহ অবস্থায় চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ নিজের স্বতন্ত্র অবস্থার অস্তিত্ব ভুলিয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, অপর এক ব্যক্তি খাইলে আমার খাওয়া হয়, অপর ব্যক্তির আনন্দ দেখিলে আমার আনন্দ হয়। এই দেহটা বিশেষ নাম রূপে আবদ্ধ। অবস্থাতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেহ দেখিতেছি। এইটির মাঝে একটা ব্যবধান রহিয়াছে কিন্তু বিদেহ অবস্থায় গেলে এই খণ্ড বা বিভিন্ন ভাবটা লুপ্ত হইয়া যায়। উচ্চ অবস্থায় গেলে সমস্ত জগৎ আমার অংশ বলিয়া বোধ হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে এই ভাব আর থাকে না। অহংই একা রহিয়াছে এবং এই অহংই বহুরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত। একই বহু, বহুই এক।

স্বর্গময় জগৎ (Millenium)—কথা প্রসঙ্গে milleniumএর কথা উঠিল। খৃষ্টানধর্মে একটি ভাব আছে যে জগতে এমন একটা সময় আসিবে তখন সমস্ত লোক শুদ্ধ, পবিত্র ও দেবভাবে পরিপূর্ণ হইবে ; সকলেই মহাপুরুষ হইয়া যাইবে, দুঃখ, দারিদ্র, অন্যায় ও অত্যাচার আর জগতে থাকিবে না অর্থাৎ স্বর্গ মর্তে নামিয়া আসিবে এবং মর্ত স্বর্গ হইয়া যাইবে। স্বামিজী এই কথার উল্লেখ

করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ইহা অসম্ভব জিনিস, শুনিতে বেশ সুন্দর কিন্তু যুক্তিপূর্ণ নহে কারণ ইহা দার্শনিক ভাবের বিরুদ্ধভাব। পুনর্জন্মবাদ বলিতেছে যে মানুষ স্তরে স্তরে উন্নত হইয়া উচ্চ স্তরে আসিবে। বুঝিলাম অনেক লোক জন্ম জন্মান্তে খুব উচ্চ অবস্থা লাভ করিবে। কিন্তু নিকৃষ্ট জীব বা পশুভাবাপন্ন জীব বা পশু, তাহারা ত' মহাপুরুষদেহ ধারণ করিবে না। তাহাদের পশু প্রবৃত্তি, নীচ প্রকৃতি বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে। এক শ্রেণী যেমন উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হইবে তেমনি অপর এক শ্রেণী পশুভাবাপন্ন থাকিবে। পশুভাবাপন্ন হইয়া ত' আর দেব দেহ ধারণ করিবে না। কারণ গতি চক্রাকারে হইয়া থাকে, সরল রেখায় নহে। সেইজন্যে সকলেই যে স্থায়ীভাবে একসঙ্গে মর্তলোকে দেবভাবাপন্ন হইবে, ইহা যুক্তিপূর্ণ কথা নয়। খৃষ্টানদের milleniumএর ভাব শুনিতে বেশ ভাল, আনন্দদায়ক কিন্তু যুক্তিপূর্ণ নয়। জগৎ চিরকালই ভালমন্দ মিশ্রিত থাকিবে। একেবারে যে দুঃখ কষ্ট বিহীন হইয়া সুখময় জগৎ হইবে, ইহা অসম্ভব। একেবারে সুখপূর্ণ সংসার হইতে পারে না। কারণ নবাগত শিশুদেহ এ জগতে থাকিবে। খ্রীষ্টাণরা, জগতে এই অযৌক্তিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া অনেককেই বিস্মিত করিয়াছে।

সত্য প্রথমে ছবির আকারে আসে—ধ্যান করিতে করিতে মন যখন স্থির হইয়া যায় এবং বিদেহ অবস্থা যখন পূর্ণ মাত্রায় আসে অর্থাৎ শরীর, স্থান, সময়, দেশ, কাল, নিমিত্ত এসব যখন আর কিছুই স্মরণ থাকে না, মন যখন মহাশূন্যে উঠিয়া যায়, তখন ধ্যেয় বস্তু তাহার চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু আধারবিহীন মহাশূন্যেতে মন বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, এইজন্য একটা অবলম্বন আবশ্যক হয়। The first impression of truth comes in the form of pictures. মহাশূন্য বা চিদাকাশে হঠাৎ ছবির মত কতকগুলি রূপ আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু তাহাদের দাঁড়াইবার ভাবভঙ্গী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালচলন নূতন ভাব

প্রকাশ করে অর্থাৎ Volumes of ideas come through expression। ভাষা দিয়া আমরা সামান্য ভাব প্রকাশ করিতে পারি কিন্তু ভাষার অতীত যে সকল ভাব আছে এবং ভাষা যাহাকে নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই জীবন্তভাব সকল তখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সকল দর্শনেতে ভয়ের কোন কারণ নাই, উত্তরোত্তর এই চিত্রদর্শন নানাভাবে পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং ক্রমশঃ উচ্চাবস্থায় লইয়া যাইবে।

* [চিদাকাশে মন উঠিলে অধ্যাস বা self projection বশতঃ ভিতরে যে এক ধ্যেয় বস্তুর চিন্তা হইতেছিল, সেইটাই চিত্ররূপে প্রতিবিম্বিত হয়। নিম্ন অবস্থায় নিজেরই চিন্তা যাহা শব্দমাত্র বলিয়া বোধ হয়, উচ্চস্তরে মন যাইলে সেই সব চিন্তা অবয়ব ধারণ করে এবং চক্ষু ও হস্তাদি সঞ্চালন দ্বারা সমস্ত ভাব প্রকাশ করিয়া যায়। সময় হিসাব করিলে এক সেকেণ্ডও সময় লাগে না কিন্তু সেই চকিতের ভিতর নূতন প্রকারের অদ্ভুত ভাব সব বলিয়া যায়। ইহাকে চকিৎ, চঞ্চল ও স্থির দর্শন এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যাঁহারা গভীর ধ্যান করেন, তাঁহারাই এই সকল বিষয় বুঝিবেন, বহু ভাষার প্রয়োজন নাই।] *

আত্ম-প্রত্যয় (**Self-realisation**)—সাধু বা যোগী পুরুষেরা প্রথম অবস্থায় সমস্ত বস্তু বাহিরে দেখেন, বাহির হইতে আদেশ বা আশীর্বাদ পাইবার চেষ্টা করেন। আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গড় করিয়া করিয়া ও মাথা ঠুকিয়া কপাল ফুলাইয়া ফেলিয়াছিলাম। সাময়িক কিছু শান্তি আসিত বটে, কিন্তু পরক্ষণে সব চলিয়া যাইত, মহা বিষণ্ণ হইয়া পড়িতাম,—কিছু হইল না বা হইবারও কোন আশা নাই। অবশেষে মহা বিরক্ত হইয়া পড়িলাম ও এত অবসাদ আসিল যে, সমস্ত বাহ্যিক ক্রিয়া, ভক্তি সব ত্যাগ

* টীকা—গ্রন্থকার।

করিলাম। তারপর ভাবিলাম বাহিরে এত খুঁজিয়া ত কিছু পাওয়া গেল না, দেখি একবার ভিতরে খুঁজিয়া যদি কিছু পাই। সব ত্যাগ করিব, এমন কি দেহ পর্যন্ত ত্যাগ করিব, ব্যর্থ জীবনের কোন আবশ্যকতা নাই। তারপর ভিতরদিকে খুঁজিতে সুরু করিলাম। বহির্জগৎ একেবারে নিভাইয়া দিলাম, ভিতরের জগতে দেখিলাম এক মহান্ ব্যাপার। তাহার কাছে বাহিরের জগৎ সামান্য মাত্র বলিয়া বোধ হয়। ধীরে ধীরে সন্দেহ কমিতে সুরু করিল, বিষণ্ণভাব চলিয়া যাইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ আত্মপ্রত্যয় বা আত্মদর্শন হইতে লাগিল। তখন বুকে একটা জোর আসিল, একটা সাহস আসিল। ভিতর দর্শন বাহির দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত বীরত্বভাব আত্ম-দর্শন হইতে হয়। সাধারণ বীরত্ব ত চাষাড়ে লোকের বীরত্ব, অল্প সময়ের জন্য, পরমুহূর্তে সে বিষণ্ণ ও কাপুরুষ হইয়া পড়ে, কিন্তু যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে, তাহারই বীরত্ব যথার্থ তেজঃপূর্ণ, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। হোঁৎকা শরীরে বা গায়ে বল থাকিলে মনের শক্তি হয় না, আত্মদর্শন হইলে মনের শক্তি হয়।

* [সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ। সাধক প্রথম অবস্থায় সাপেক্ষ বা বাহ্যিক বস্তু অবলম্বন করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া থাকে। শাস্ত্রাদি পাঠ, সৎসঙ্গ, তীর্থাদি দর্শন এ সমস্তই সাপেক্ষ ভাব এবং ইহা প্রথম অবস্থায় প্রয়োজনীয়। এই অবস্থা পরিপক্ক হইলে মন আর পূর্বপদ্ধতিতে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। এই সময় মনে একটা অবস্থা আসে, তাহাকে neutral zone বলে। অর্থাৎ পূর্ব অভ্যস্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু নূতন কিছু পাই নাই। খেদের ভাব আসে, তখন অনেকেই পলায়ন করেন, আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন না, এবং সমস্ত কাজ ভুল হইয়াছে, এই ধারণা করিয়া সাধন-ভজন সব ত্যাগ করেন। অল্প সংখ্যক ব্যক্তি শুধু এই neutral zone পার হইতে পারে। তখন তাহারা নিরপেক্ষ অবস্থায় যাইবার চেষ্টা করেন। যে সব ভাব সাপেক্ষ বা অপর বস্তুর সহিত

সংশ্লিষ্ট আছে, তাহা একেবারে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন। পরস্পর নির্ভরশীল ভাবধারা (Inter-dependent ideas) হইতে absolute ideaতে আসিবার চেষ্টা করেন। এই কঠোর পথ অবলম্বন করিয়া সাধক আত্মদর্শন করেন।] *

আত্মার বিকাশই সর্বপ্রধান বস্তু—আত্মবোধ বা আত্মার যখন উপলব্ধি হয় এবং প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মের বিকাশ, এই জ্ঞান যখন মানুষের উপলব্ধি হয়, তখন লোকটি স্বতন্ত্র হইয়া যায়। বাহ্যিক চাক্‌চিক্য তাহাকে আর বিশেষ অভিভূত করিতে পারে না। আমার পরিব্রাজক অবস্থাতে খাওয়া শোয়ার অনিশ্চয়তার জন্য শরীর সর্বদা অসুস্থ ও পীড়িত থাকিত। আমি অনেক ঔষধ খাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে বিরক্ত হইয়া ঔষধ সেবন একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম এবং ভিতরে যে জিনিস রহিয়াছে, তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলাম। তখন মনে জোর আসিল। শরীরের সমস্ত ব্যাধিকে তাড়াইয়া দিলাম, শরীর তখন সুস্থ হইল। ভিতরকার আত্মা জাগ্রত হইলে, মানুষের শরীর অন্যপ্রকার হয়। সেই হইতে আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে। কখন কখন একটু আধটু সর্দি হয়, তাহাতে ঔষধ বড় খাইতে হয় না। আত্মার বিকাশই সর্বপ্রধান বস্তু।

যোগীর মাদক দ্রব্য খাইলেও বিশেষ কিছু ফল হয় না—যোগী উচ্চ অবস্থায় উঠিলে তাহার শরীর অন্য প্রকার হইয়া যায়। মদের প্রক্রিয়া সাধারণ লোকের উপর সমানভাবে হইয়া থাকে, কিন্তু উচ্চ অবস্থার যোগীর ইহাতে কিছুই হয় না। মদ্য ও জল এ দু'য়ের প্রক্রিয়া একপ্রকারই হয়। জল পান করিলে যেমন শরীরে কোন চাঞ্চল্য হয় না, তেমন সিদ্ধ যোগী মদ্য পান করিলে তাহারও শরীরে কোন প্রকার প্রক্রিয়া লক্ষিত হয় না। এমন কি শাস্ত্রে বলে যে, সিদ্ধ যোগীকে বিষ সেবন করাইলেও

তাহার কোন অনিষ্ট হয় না। কারণ মন উচ্চ স্তরে উঠিলে, নিম্ন-স্তরের কোন ক্রিয়া তাহাতে বর্তায় না।

* [এক এক স্তরের স্নায়ু এক এক প্রকার কার্য করিয়া থাকে। নিম্ন স্তরের স্নায়ুর কার্য উচ্চস্তরে ফলদায়ক হয় না। মন বা শক্তি যখন উচ্চস্তরে থাকে, তখন নিম্নস্তরের স্নায়ুর ক্রিয়া উচ্চস্তরের স্নায়ুকে কোন প্রকারে চালিত করিতে পারে না।] *

স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, আমি এক বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা জানি। তাঁহার শরীরের এক অংশ পুড়িয়া যাইলেও সমাধি অবস্থায় তাহার কোন বোধ হয় নাই। যদিও অপর লোকে মাংস পোড়ার গন্ধ পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি উচ্চস্তরে বা সমাধিতে অবস্থান করাতে শরীরের এক অংশের যন্ত্রণা অপর অংশকে চঞ্চল বা ব্যথিত করিতে পারে নাই। কিন্তু মন যখন উচ্চ অবস্থা হইতে পুনরায় নিম্নস্তরে নামিয়া আসিল এবং ব্যথিত স্থানে সংলগ্ন হইল, তখন তিনি পুড়িয়া যাওয়ায় যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। মন যখন শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তখন তাহার বেদনা উপলব্ধি হয়। কিন্তু মন যখন উচ্চস্তরে চলিয়া যায়, তখন স্থূল শরীরের বেদনা (sensation) সূক্ষ্ম শরীরকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

নিষ্ক্রিয়মন—ধ্যান করিতে করিতে প্রথম আনন্দ হয় এবং মনটা উত্তোরত্তর উর্দ্ধে গমন করে। কিন্তু একটা স্থানে আসিয়া মনটা নিষ্ক্রিয় (paralysed) হইয়া যায়, আর যেন মনের শক্তি থাকে না। মনটা যেন dull বা নিস্তেজ হইয়া যায়। সেইসময় কৃপা, আশীর্বাদ, ভক্তি প্রভৃতি একটি করিয়া বা সমস্তগুলি একত্র করিয়া চেষ্টা করিতে হয়। সেই স্থানটি এইভাবে পার হইলে পুনরায় ধ্যান চলিতে থাকে।

* [মনের শক্তি একটি কেন্দ্রে আসিবার চেষ্টা করিতে করিতে

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

কিছুদিন পর সেই শক্তিটা নিস্তেজ বা শ্লথ হইয়া যায়, মন যেন আর কিছু করিতে চায় না। তখন মনকে একটু বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। কিছুদিন আবার সে শক্তি সঞ্চয় করুক, তারপর পুনরায় এক কেন্দ্রে শক্তি নিবিষ্ট করিয়া উচ্চ অঙ্গের ধ্যান করিবে। মনে শক্তি আনিবার উপায় ভক্তি বা অন্যান্য সৎ চিন্তা। এইস্থানে একটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। মন প্রথম কামলোকে বা Region of desires অর্থাৎ বাসনার স্তরে থাকে। তারপর মনটা তুলিলে বা উর্দ্ধদিকে যাইলে Region of forms রূপলোকে যায়। সেইস্থানে বহুপ্রকার জীবন্ত চিত্র দেখা যায়। তারপর পুনরায় মন উর্দ্ধদিকে উঠিলে ভাবলোকে বা Region of ideasএ যায়। এই স্থলে ভাব একা বা সমষ্টিভাবে রূপ ও অবয়ব ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়ায় এবং হস্ত সঞ্চালন দ্বারা বা চক্ষুর ভাবভঙ্গীতে বহুপ্রকার ভাব বলিয়া যায়। অনেক সময় অশরীরী বাণী শুনা যায়। হঠাৎ শূন্যে যেন কে একটা কথা বলিয়া গেল। এই স্থান অতিক্রম করিলে, জ্ঞানলোকে বা Region of knowledgeএ মন যায়। তথায় সর্ববিষয়ে জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু জ্ঞান বহুপ্রকার, সেইজন্য ইহা খণ্ডজ্ঞান, ইহাকে অখণ্ড জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। তারপর আনন্দময়লোক বা Region of Bliss। সেখানে সমস্ত খণ্ডজ্ঞান দ্রব হইয়া এক হইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার উপরের স্থানকে কেহ শিবলোক, কেহ বা ব্রহ্মলোক অর্থাৎ পূর্ণ সমাধি অবস্থা বলিয়া থাকে। কবি ও দার্শনিক রূপলোকে ও জ্ঞানলোকে বিচরণ করে। সিদ্ধ যোগীরা অপর দুইটি ক্ষেত্রে যাইতে পারেন।] *

প্রত্যাদেশ বা অশরীরী বাণী—ধ্যান করিতে করিতে যখন ধ্যান খুব জমিয়া যায় অর্থাৎ সাধক নিজে যখন বিদেহ হইয়া যায় বা স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, (এই অবস্থাতে

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

বাহ্যিক সমস্ত জগৎ লয় হইয়া যায়, কেবল ব্যোম বা শূন্য থাকে) তখন নিজের ভিতর হইতে একটি প্রশ্ন তুলিতে হয়। সেই প্রশ্ন কয়েক দিবস পরে ঘুরিয়া আসিয়া নিজের উত্তর প্রদান করে।

* [ধ্যান খুব জমিতেছে কিনা, এই বিষয়টিতে যেমন আমরা খুব নজর রাখি, তেমনি আর একটি বিষয়ে আমাদের নজর রাখিতে হইবে যে, আমরা স্থূল-শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-শরীরে ক্রমশঃ যাইতেছি কি না। ধ্যান করিবার সময় যে যত সূক্ষ্ম-শরীরে যাইতে পারে, তার তত ধ্যান জমিয়া যায় অর্থাৎ স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-শরীরে যাইলে খুব উচ্চ উচ্চ চিন্তা আসে। মন যখন সূক্ষ্ম-শরীর হইতে কারণ-শরীরে যায়, তখন বিপরীত চিন্তা সকল লয় পাইতে থাকে এবং একটি মাত্র চিন্তায় উপনীত হয়। এই স্থানকে ব্যোম বা শূন্য বলে। কোন কোন গ্রন্থে ইহাকে "গম্ভীরম্" বলিয়া থাকে। এইস্থানে বেশীক্ষণ মন রাখা সম্ভব নয়, কারণ ইহাকে neutral zone বলে। মনটা অগ্রসরও হইবে না, পশ্চাৎপদও হইবে না—যেন নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। যাঁহাদের কেবলমাত্র স্থূল আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান আছে, তাঁহারা প্রথম প্রথম এই স্থানটিতে বড় ভীত হইয়া পড়েন, কারণ তাঁহাদের পূর্ব সঞ্চিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লয় হইয়া যায় এবং তখন নূতনও কিছু পান নাই, সেইজন্য এই স্থানটিতে বড় ভীত হইয়া উঠেন। কিছুদিন অভ্যাসের পর আবার এই স্থানটি অতি প্রিয় বলিয়া বোধ হয়।

এই স্থানে একটি প্রশ্ন হইতেছে, নিজের দেহ বা ব্যক্তিত্বজ্ঞান লয় হইয়াছে কি না? অশরীরী অবস্থায় বা সূক্ষ্ম-শরীরে বা কারণ-শরীরে মন উঠিলে নিজের ব্যক্তিত্ব জ্ঞান বা পূর্ব অবয়বের স্মৃতি থাকে কি না। এই বিষয়ে মতের দুটি বিভিন্নতা আছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, এরূপ অবস্থানে দেহের পূর্ব স্মৃতি একেবারে লয় হয় এবং ব্যোমের সঙ্গে মিশিয়া যায়। আর এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, নিজের ব্যক্তিত্ব জ্ঞান লয় হয় না, অতি সূক্ষ্ম

অবস্থাতে থাকে, তাহা একেবারে নষ্ট হইতে পারে না। ব্যক্তিত্ব জ্ঞান থাকাই যুক্তিসঙ্গত এবং অনেক সাধকও এই কথা বলেন। এই সময় অন্তর হইতে একটা প্রশ্ন উঠে। সেই প্রশ্ন চক্রের মত বা বর্তুলাকারে নিজের কাছে উত্তররূপে ফিরিয়া আসে। যাহা পূর্বে প্রশ্ন ছিল, তাহাই পরে উত্তররূপে ফিরিয়া আসে অর্থাৎ চিদাকাশে প্রশ্নরূপ আখ্যা দিয়া স্পন্দন করিতে হয়; পরে এই চিদাকাশ হইতে প্রসূত স্পন্দন চিদাভাস হইয়া যায়। বুদ্ধের সাধনার বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, যখন তিনি উরুবিম্বে নগ্রোধ বৃক্ষের নিম্নে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিতেন এবং সেই প্রশ্ন উত্তররূপে ফিরিয়া আসিত। ইহা যে শুধু বুদ্ধদেবের জীবনে হইয়াছিল তাহা নহে, বহু সাধকের জীবনেও ইহা পরিলক্ষিত হয় এবং স্বামিজীর জীবনেও ইহা বহুবার হইয়াছিল। *

আত্ম-বিকাশ—Self-projection বা আত্মবিকাশের কথা উঠিল। সেইদিন তিনি অনবরত এই বিষয়ে দার্শনিকদের মতগুলি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, জগৎটা যে কি তাহা আমাদের বিশেষ জানা নাই। আমরা শুধু আত্মবিকাশের দ্বারা জগৎটা সৃষ্টি করিতেছি। বাহিরে শুধু একটা উদ্দীপক (suggestion) মাত্র আছে, তা ছাড়া আর কিছু বেশী বলা যায় না। সেই উদ্দীপক আমার চিত্তকে স্পন্দন করিতেছে এবং তদনুযায়ী আমি আমার জগৎ সৃষ্টি করিতেছি। তারপর বামদিকের দেওয়ালের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, এই সম্মুখে যে দেওয়ালটি রহিয়াছে, এর বিষয় আমি বিশেষ কিছু জানি না। শুধু বাহিরে একটা উদ্দীপক আমার চিত্তকে চঞ্চল বা স্পন্দন করিতেছে এবং তদনুযায়ী আমি এই দেওয়ালটিকে দেখিতেছি। দেওয়ালের ত্রি-চতুর্থাংশ আমার মনের সৃষ্টি, বাকী এক চতুর্থাংশ উদ্দীপক; কিন্তু প্রকৃত দেয়ালটির

* টীকা—গ্রন্থকার।

বিষয় আমি বিশেষ কিছু জানি না। আমি একভাবে দেওয়ালকে দেখিতেছি, অপর সকলে অন্যভাবে দেখিতেছে, সেইজন্য দুইজনের দেওয়াল সম্বন্ধে জ্ঞান এক হয় না। কিছু বিভিন্নতা থাকে। সমস্তই নিজের ভিতর হইতেছে। সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ যা কিছু আছে, সবই নিজের আত্মবিকাশের দ্বারা করিতেছি এবং তাহাতেই অভিভূত হইতেছি।

সোহং সোহং—আত্ম-বিকাশের বিষয় বলিতে বলিতে স্বামিজী অতি গম্ভীর হইয়া গেলেন। তিনি যেন সম্পূর্ণ বিদেহ হইয়া গেলেন। তেজঃপূর্ণ মুখ, চক্ষু স্থির ও স্বর আজ্ঞাপ্রদ হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সমস্ত সৃষ্টিটাই অহংএর আত্ম-বিকাশ (self-projection)। সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, মুক্তি বন্ধন সমস্তই অহংএর আত্মবিকাশ। অহং যখন যেভাবে বিকাশ করিতেছে, আমি তখন সেইভাবে জগৎ দেখিতেছি। আমি যখন নিজের ভিতর মুক্তভাব দেখিতেছি, তখন জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিতর মুক্তভাব দেখিতেছি, তাই আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেছি। আবার যখন ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য, মুক্ত বদ্ধ ভাবের উপরে চলিয়া যাইতেছি, তখন দেখিতেছি যে অহংই এক হইতেছে, অহংই বহু হইতেছে।" স্বামিজী এত উচ্চাবস্থায় চলিয়া গিয়া বলিতেছেন যে, সকলেই তাঁহার সেই তেজঃ-পূর্ণ মুখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিল। ঘরটি নিস্তব্ধ, এমন কি নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শুনা যাইতেছে না। সেই উচ্চস্তরে উঠিয়া স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "সোহং সোহং, আমিই সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা। জগৎ, দেহ, মন যা কিছু বাহ্যিক জিনিষ, সমস্তেতেই আমি ব্যাপ্ত। আমিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছি, আমিই সমস্ততে লিপ্ত আছি, আমি যেমন এ দেহতে রহিয়াছি, তেমনি প্রত্যেক দেহতে আমিই বিরাজ করিতেছি। আমিই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সব সৃজিত বস্তুই আমার। I am a voice without a form. দেহ বাহিরের জিনিষ, জগৎ বাহিরের জিনিষ, চিন্তা—সেও বাহিরের জিনিষ।

আমি একমাত্র বাণী—কোন রূপ নাই, কোন আবরণ নাই।” মাঝে মাঝে তিনি বলিতে লাগিলেন, “সোহং সোহং সোহং। এই ভাবটাই হিন্দুরা জগৎকে দিয়াছে। এই ভাবের ভিতর নরকের ভয় বা cringing tendency থাকে না। সর্ব বস্তুতে একত্ব প্রতিষ্ঠা করাই এই ভাবের উদ্দেশ্য।” কথাগুলি সেইদিন এত গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল যে শ্রোতারা শুনিবে কি দেখিবে, কি ধ্যান করিবে তা প্রভেদ করিতে পারিতেছিল না।

শরীর পরমাণু স্রোত—শরীরটা পরমাণুর স্রোত (Body is a stream of matter)। আমরা সাধারণতঃ শরীরকে স্থিতিশীল বা স্থায়ীভাবে দেখিতেছি। কিন্তু শরীরে প্রত্যেক মুহূর্তে পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে এবং এই সতত পরিবর্তনকে আমরা সাময়িক স্থিতি বলিয়া পরিগণিত করিতেছি। শিশু অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্য অবস্থা পর্যন্ত পরিলক্ষণ করিলে আমরা কি দেখি? ব্যক্তি যে সে একই আছে, কিন্তু আবরণ বা শরীরটা প্রত্যেক মুহূর্তেই পরিবর্তিত হইতেছে। আহারাদি, বায়ুসেবন ইত্যাদি দ্বারা আমরা পরমাণু সমষ্টি ভিতরে গ্রহণ করিতেছি এবং কিছু সময় পরে সেই সকল আবার নানা প্রকারে পরিত্যাগ করিতেছি। গ্রহণ ও পরিত্যাগ এই দুইটার মধ্যে যে পরিবর্তন হইতেছে, তাহাকেই আমরা স্থিতি বলিতেছি। পরিবর্তনকেই আমরা স্থিতি আরোপ করিয়াছি, কারণ আমাদের ভিতরে স্থিতিজ্ঞান আছে।

আমরা যেমন এক স্রোতস্বতী নদীতে দুইবার ডুব দিতে পারি না। কারণ একটি ডুবের পর দ্বিতীয় ডুব দিবার মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে, সেই সময়ের মধ্যে আমার বয়স একটু বেশী হইয়া গিয়াছে, সূর্য একটু বেশী উঠিয়াছে, নদীর জল খানিকটা চলিয়া গিয়াছে, গাছের পাতা পড়িয়া গিয়াছে, নদীর মাটি খানিকটা ভাসিয়া গিয়াছে ইত্যাদি, অর্থাৎ দুইটা ডুব দিবার মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য এক নদীতে দুইবার ডুব

দেওয়া যায় না। বর্তমান কাহাকে বলে? যখন কোন বিষয় চিন্তা করিতেছি, জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করি নাই, তখন তাহাকে ভবিষ্যৎ বলে; কিন্তু যেমন উচ্চারণ করিয়াছি তখনই তাহার কার্য সমাপ্ত হইয়াছে, চলিয়া গিয়াছে; সেইজন্য তাহা অতীত হইল। ভবিষ্যত বুঝি, অতীত বুঝি, কিন্তু বর্তমান কোন জিনিষটা? অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গমকে অনুমান করিয়া আমরা এক বিশেষ নাম দিয়াছি, তাহাকে বর্তমান বলিতেছি। কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা হইতে হইতেই ইহা অতীতে চলিয়া যাইতেছে। আমাদের শরীর কতকগুলি পরমাণুসমষ্টি। এক প্রকার ছিদ্র দ্বারা পরমাণু সকল প্রবেশ করিতেছে, আবার অন্য প্রকার ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্তনের নামই স্থিতিমান্ শরীর। উদাহরণ-স্বরূপ মৌচাকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। দূর হইতে আমাদের বোধ হয় যে, মৌচাকের মাছিগুলি মৌচাকে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু নিকটে যাইলে আমরা দেখিতে পাই যে মাছিগুলি সব সময় চঞ্চল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অল্প পরিসরের ভিতর এখান হইতে ওখানে উঠিয়া যাইতেছে, কতকগুলি উঠিয়া পলাইতেছে ইত্যাদি। এই সতত চঞ্চল অবস্থাকে আমরা দূর হইতে স্থির অবস্থা বলিতেছি। শরীর বা যাহার নাম রূপ আছে, সেটিও এইরূপ চঞ্চল জিনিষ, অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে।

অষ্ট-সিদ্ধির কথা—স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, জপ ধ্যান করিতে করিতে কুণ্ডলিণী যেমন উপরে যায়, তখন এক এক পদ্মেতে এক এক রূপের বিকাশ হয়। কিছুটা উপরে উঠিলে অষ্ট-সিদ্ধির বা কতক প্রকার শক্তি ভিতরে আসে। শক্তি আসা অনিবার্য। কিন্তু এই শক্তি ব্রহ্মদর্শনের বা উচ্চ-অবস্থার মহা অন্তরায়। এই সকল অষ্ট-সিদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। যাহার মন ইহাতে আটকাইয়া যায় অর্থাৎ এই অষ্ট-সিদ্ধিতে মোহিত হইয়া পড়ে, তাহার এইখানেই শেষ হইয়া যায়, আর বিশেষ অগ্রসর

হইতে পারে না এবং পরিশেষে নিম্নগতি বা পতন হয়। স্বামিজী এই অষ্টসিদ্ধির বিষয় সকলকে বিশেষ নিষেধ করিলেন।

এক অষ্টসিদ্ধ যোগী ও এক ভক্তের কথা—তিনি একটী গল্প বলিতে লাগিলেন যে, এক ভক্ত খুব একটা উচ্চ পাহাড়ের উপর একখানি কুটীরে বসিয়া ভগবানের নাম করিত এবং যাহা জুটিত আহার করিয়া দিন যাপন করিত। এক দিন এক অষ্টসিদ্ধ যোগী আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে ভক্তটীকে রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এই পাহাড়ে বসিয়া কি করিস্?" ভক্তটী বলিল, "কি আর করিব, বসিয়া বসিয়া ভগবানের নাম জপ করি, আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকি।" অষ্টসিদ্ধ যোগীটি বলিল, "আমার বিভূতি দেখাব, দেখ্ আমার কত শক্তি আছে" এই বলিয়া সে শূন্যেতে হাত তুলিয়া বলিল, "আয় ঝড়", আর অমনি চারিদিক হইতে মেঘ আসিয়া ঝড়, বৃষ্টি বাদল হইতে লাগিল। অনেক গাছ পালা উপড়াইয়া পড়িল, পাহাড়ের ধারে যে সকল পথিক যাইতেছিল, তাহাদের ভিতর কতক মারা পড়িল। ভেড়া ছাগল সব মারা পড়িয়া যেন একটা মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হইল।

তারপর অষ্টসিদ্ধ যোগী বলিল, "আমার আর এক বিভূতি দেখ্‌বি?" বলিয়া সে বলিল, "যা ঝড়, থেমে যা। রৌদ্র আয়, আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে যা।" এই বলিবামাত্র ঝড় সব চলিয়া গেল, মেঘ সব সরিয়া গেল, আর বেশ খট্‌খটে রৌদ্র হইল। আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেলে ভক্তটি এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল যে, অনেক গাছ পড়িয়া গিয়াছে, জন কতক মানুষ মরিয়াছে এবং অনেক ছাগল ভেড়াও মরিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভক্তটী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যোগীটী বলিল, "দেখ্‌লি, আমার শক্তি দেখ্‌লি। আমার আদেশে ঝড় আসতে পারে এবং আমারই আদেশেতে আবার সব বন্ধ হইয়া যেতে পারে।" তখন সেই ভক্তটী বলিতে লাগিল "তোমার এ অষ্টসিদ্ধাই অতি দূষনীয়

কার্য হইয়াছে। কারণ তুমি এতগুলি প্রাণী হত্যা করিলে, কত অনিষ্ট করিলে, কেবল নিজের অহঙ্কার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। কিন্তু তোমার এই শক্তি লাভ করিয়া কি ভগবৎ দর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে? তুমি প্রথমে তপস্যা করিয়াছিলে যে, কোন প্রকারে যেন ভগবৎদর্শন হয়। এখন মাঝ পথে সে উদ্দেশ্য তোমার ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আসল উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া তুমি ভিন্ন পথে চলিয়া গিয়াছ, এগুলি তোমার ঐশ্বর্য নয়, এগুলি তোমার অন্তরায় হইয়াছে। আর তুমি সেই সাধক নও, এখন নিম্ন স্তরের লোক হইয়া গিয়াছ। এই বিভূতি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর, তাহা হইলে ব্রহ্মে উপনীত হইতে পারিবে।" ভক্তটীর কথা শুনিয়া যোগীটী লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং তাহার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া সেই ভক্তটীর আশ্রিত হইয়া তাহারই কাছে রহিয়া গেল এবং তদবধি অবশিষ্ট জীবন ব্রহ্মচিন্তায় যাপন করিল।

দূরাৎ দর্শনম্, দূরাৎ শ্রবণম্—শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর অনেকেই এই কথাটী শুনিল, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি জিনিষ তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। স্বামিজী নিজের ভিতর কি বিভূতি আছে দেখাইবার জন্য প্রায় ৪৫ মিনিট সেই শক্তি বাহির করিলেন। তিনি সকলকে বলিলেন, "যাহার যা প্রশ্ন বা মনের কথা আছে, লিখিয়া নিজের ইজেরের পকেটের ভিতর রাখিয়া দিন, আমি সকলের মনের কথা বলিয়া দিতেছি।" সকলে তদ্রূপ করিলেন। তখন স্বামিজী বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "Now the question is this, প্রশ্নটী এই।" যেমন এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, অপর দিকের একটী লোক তাহার ইজেরের পকেট হইতে কাগজটী বাহির করিয়া দেখিল—প্রশ্ন ঠিক লেখা রহিয়াছে। তাহার হাব ভাব দেখিয়া লোকের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, প্রশ্নটী ঐ লোকটীর। কিন্তু পাছে সেই লোকটী অপ্রস্তুত হয়, এইজন্য স্বামিজী অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "একটী

বড় রাস্তাতে সদর দরজা পার হইয়া একটী corridor আছে, সম্মুখে সিঁড়ি এবং তাহার ডানদিকে একটী ঘর আছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতলায় একটী ঘর আছে, ঘরে একটী বিছানা পাতা এবং তাহার উপর একটী ছোট ছেলে শুইয়া ঘুমাইতেছে।"

যাহার এই প্রশ্নটি মিলিয়া গেল, সে ত মহা খুসী—আহ্লাদ আর মুখে ধরে না।

তাহার পর আর একটি প্রশ্ন ধরিলেন, পূর্বেরই মত বিপরীত দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রশ্নটি এই।" যাহার প্রশ্ন, সে ত ইজেরের ভিতর হইতে কাগজ বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিল, থতমত খাইয়া গেল এবং একদৃষ্টে স্বামিজীর দিকে চাহিয়া রহিল, কি জানি কি কথা বলিয়া দেবেন। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "দোতলার ঘরে বিছানায় একটি ছেলে শুইয়া আছে, বিছানার পার্শ্বে একটি ছোট টেবিলের উপর কতকগুলি ঔষধের শিশি রহিয়াছে। ছেলেটি পীড়িত, কিন্তু ভাল হইবে, কিছুদিন পরে বেশ সুস্থ হইবে।"

আর একদিকে চাহিয়া আর একটি প্রশ্ন তুলিলেন। যাহার এই প্রশ্নটি, তাহার চঞ্চল ভাব দেখিয়া বলিলেন, "একটি ঘর, ঘরের মাঝে একটি টেবিল, টেবিলের পার্শ্বে একটি চেয়ারের উপর একজন বৃদ্ধ বসিয়া আছে।"

এইরূপে অনেকের প্রশ্নের কথা তিনি হুবহু বলিয়া দিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারটি লেকচারের পর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে হইল। আসল লেকচারের সময় এইটি হয় নাই। কিন্তু অপর রাত্রে যেমন শ্রোতৃবৃন্দ আহ্লাদে চলিয়া যাইত, সে রাত্রে আর তেমন হইল না, সকলে ভয়ে ত্রস্ত হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ সিদ্ধযোগীর কথা শুনিয়া সকলের মনে ধারণা হইল যে, স্বামিজী এক মহা সিদ্ধযোগী। অন্যদিন যাইবার সময় যেমন স্বামিজীর সহিত মিষ্ট আলাপ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ যাইত, কিন্তু সেই রাত্রে সকলে ভয়ত্রস্ত

হইয়া স্বামিজীর দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া শঙ্কিতচিত্তে যাইতে লাগিল। কারণ তাহাদের ভিতর বিশেষ ধারণা হইল যে, স্বামিজী ভীষণ লোক, সব মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন। সে রাত্রে হাসি-তামাসার ভাব ছিল না, একটি ত্রস্ত ভাব খুব হইয়াছিল। সেই রাত্রের লেকচার অতি গম্ভীর ও সুন্দর হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত ও আত্মহারা হইয়া শুনিয়াছিল।

ছবিটি উল্টাইয়া আসে—পরদিনের লেকচারে স্বামিজী এই 'দূরাৎ দর্শনম্, দূরাৎ শ্রবণম্' বুঝাইতে লাগিলেন। মনটা যখন উচ্চ অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে বিদেহ হইয়া যায়, তখন দূরত্ব বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না। দূর, অতীত, ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু থাকে না। সবই কাছে থাকে। মনটাকে নিষ্ক্রিয় বা Neutral করিতে হয়। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় রাখিয়া মনটাকে কোন বস্তুতে আরোপ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুর ভিতরকার সমস্ত জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বলে 'দূরাৎ দর্শনম্'। কিন্তু বস্তুটি যখন ছবি হইয়া আসে, তখন সোজাভাবে আসে না, ব্যোম-পথ (astral plane) দিয়া আসিবার সময় ছবিটি উল্টাইয়া যায়। যথা—একটা ঘরে কয়েকজন লোক বসিয়া আছে, মাঝে একখানা টেবিল রহিয়াছে। আমি ইহার মধ্যে কোন এক বিশিষ্ট লোককে দেখিতে ইচ্ছা করি, দেখিব কি না অপর সকলে ঠিক বসিয়া আছে, কিন্তু বিশিষ্ট লোকটি উল্টাইয়া গিয়াছে। চেয়ারের পায়া উপর দিকে এবং আসীন ব্যক্তির মাথাটি নীচুদিকে। তখন বুঝিতে হইবে যে এই বিপর্যস্ত ব্যক্তিই বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহার চক্ষুর স্নায়ুশক্তি প্রবল, এই দর্শনশক্তি তাহাতে প্রথম আসিবে ; যাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় প্রবল, তাঁহার এই শক্তি প্রথম কর্ণে প্রস্ফুরিত হইবে, ইহাকে 'দূরাৎ শ্রবণম্' বলে। যোগীরা বলেন যে, মনুষ্যের কথা ত শুনিতে পাইবেনই, এমন কি পশু পক্ষী পতঙ্গের কথা পর্যন্ত শুনিতে পাইবেন। আমি নিজে যতদূর করিয়াছি,

তাহাতে এই সব অনেক দেখিয়াছি। I never preach what I not practise—আমি নিজে যাহা করি না, তা আমি কাহাকেও বলি না। কিন্তু যোগীদের গ্রন্থে এই সব লেখা আছে, ইহাতে আমার অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

যাঁহার ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল, তিনি দূর হইতে ঘ্রাণ লইতে পারিবেন এবং পরে শক্তি এক ইন্দ্রিয় হইতে আবার সকল ইন্দ্রিয়েতে সঞ্চারিত হইবে। এই সমস্ত লেকচারে অনেক লোক আসিতে লাগিল এবং স্বামিজীর যে অলৌকিক যৌগিক শক্তি আছে, তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহারা বাইবেলে শুনিয়াছিল যে, শক্তির ক্রিয়া সকল যীশুর ভিতর প্রবলভাবে প্রকাশ পাইত, কিন্তু সে সকল সেকালের কথা। তাহাদের ধারণা ছিল যে, এখনকার মানুষের ভিতর সে শক্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাহারা স্বামিজীর এই শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল এবং স্বামিজীকে Superior person ভাবিল এবং সেইরূপই সম্মান করিতে লাগিল।

জপধ্যান করিলে গায়ে আবরণ হয়—কিছুকাল ধরিয়া জপ-ধ্যান করিলে শরীরের পরমাণু পরিবর্তিত হইতে সুরু হয়, তারপর পুরাতন পরমাণু পরিবর্তিত হইয়া নূতন পরমাণুর সৃষ্টি হয়। দেহটী যেন সামান্য ভাবে বদলাইয়া যায়। সাধারণ লোকের দেহ ও যোগীর দেহ ভিন্ন উপাদানে গঠিত। প্রবৃত্তি হইতেই পরমাণুর সৃষ্টি এবং স্পন্দন। মনই শরীরের সৃষ্টি করে—Mind creates this body. যোগীর গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল, কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ ও মধুর এবং দৃষ্টি স্নেহপূর্ণ ও আকর্ষণীশক্তিসংযুক্ত এবং তাঁহার মূর্তি শান্ত ও সৌম্য। তারপর যোগী যখন উচ্চ অবস্থায় উঠেন, তখন তাঁহার গাত্র হইতে একটা আকর্ষণীশক্তি বা আভা বাহির হয়। এই আভা নীচ প্রকৃতির লোকের নিকট ভীষণ এবং আতঙ্কদায়ক। এই শ্রেণীর লোকের কাছে বসিলে মনে একটা ত্রাস বা চিত্ত-চাঞ্চল্যের উদ্রেক হয়, যেন লোকটার ভিতর হইতে বেশ একটী বিভীষিকা নির্গত হইতেছে।

কিন্তু একজন সিদ্ধ যোগী আসিলে, স্বভাবতঃই তাঁহার ভিতর হইতে স্নিগ্ধ, আনন্দপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ভাব নির্গত হয়। সিদ্ধযোগী ইচ্ছা করিলে এই আবরণ বা Halo বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে পারেন।

* এই বিষয়টী খোলাভাবে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মত মিশ্রিত করিয়া চলিতে লাগিল এবং অনেক ঐতিহাসিক উপাখ্যানও চলিতে লাগিল। কিন্তু এই সঙ্গে বলিয়া যাওয়া আবশ্যক যে, স্বামিজী লেকচারে সে সকল লক্ষণগুলি বলিতে লাগিলেন, নিজের ভিতরও সেই ভাবলক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। কারণ, সাধারণ বাঙ্গালীর রং হইতে স্বামিজীর রং অনেক পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়াছিল। উজ্জ্বল মানে সাদা এই অর্থে নয়, গাত্রের ভিতর হইতে প্রকৃত একটা আভা বাহির হইত, বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইত। কণ্ঠস্বর, চক্ষুর দৃষ্টি প্রভৃতি সকল স্পষ্ট বিভিন্ন প্রকারের যেন বিকাশ অর্থাৎ দেহেতে আছে—কিন্তু দেহ ছাড়া। অনেক সময় কষ্ট করিয়া মনটী দেহের ভিতর আনিতে হইত, না হইলে মনটী একেবারে উচ্চস্তরে থাকিয়া যাইত। কখন বা একেবারে শিশু-বালক, কখন বা প্রবীণ। কিন্তু সাধারণ হিসাবী লোক যাহাকে বলে—সেই ভাব একেবারে ছিল না। লেকচারের বিষয় নিজেই উদাহরণ হইয়াছিলেন। *

ধ্রুবের কথা—ধ্রুবের কথা উঠিল। অল্পবয়স্ক বালক সরল প্রাণে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বনে তপস্যা করিতে গিয়াছে। নিয়ম পদ্ধতি কিছুই জানে না। কিন্তু সরল প্রাণে, সরল বিশ্বাসে ভগবানকে ডাকিতেছে। পরে নানারূপ বিঘ্ন আসিল; বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু আসিল, কেহ হিংসা করিল না, সকলেই আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল।

বাঘ, ভল্লুক, প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকলেই হিংসা করিয়া থাকে। সকলেই আক্রমণ করিয়া থাকে, মানুষের মাংস আহার করিয়া

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

থাকে। কিন্তু ধ্রুবকে কিছু বলিল না, ইহার কারণ কি? আমি যদি অপরের অনিষ্ট চিন্তা করি—আমার ভিতর হইতে হিংস্র অনিষ্টকর স্পন্দন উঠিবে, সেই স্পন্দন আমার চারিদিকে থাকিবে, সেই পরিধির ভিতর যে কেহ আসিবে তাহারই ভিতর হিংসার ভাব জাগ্রত হইবে এবং পরিশেষে সেই হিংসা নৃশংসভাবে আমাতেই আসিবে। কিন্তু আমি যদি লোকের মঙ্গল কামনা করি এবং শান্তিপূর্ণভাবে চিন্তা বিকীরণ করি, তাহা হইলে সেই চিন্তা নিজ কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিবে। এই শান্তিপূর্ণ স্পন্দন চতুর্দিকে প্রবাহিত হইবে। সেই শান্তিপুর্ণ ভাবের পরিধির ভিতর যাহারা আসিবে, তাহারা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য শান্তভাব ধারণ করিবে। আমি নিজে এইসব বিষয় কতকটা করিয়া দেখিয়াছি এবং ইহা যে হয়, তাহা ঠিক বলিয়া বিশ্বাস করি। ইহা বেশী পরিমাণে বা বিভিন্ন প্রকারে হইতে পারে, এই বিষয় আমি সম্পুর্ণ বিশ্বাস করি। হিংস্র জন্তু এই শান্তিপুর্ণ স্পন্দনের ভিতর আসিলে, সাময়িকভাবে তাহাদের হিংস্রভাব তিরোহিত হইয়া শান্তভাবের উদ্রেক হয়। কারণ তাহাদেরও শিশুমণ্ডল আছে, তাহারাও এককালে মার সঙ্গে চরিয়াছে—হিংস্র মানে প্রতি মুহূর্তে হিংস্রতা নয়, এক সময় হিংস্র, এক সময় শান্ত। এই ধ্রুবের উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়, যোগীর গাত্র হইতে স্নিগ্ধ স্পন্দন প্রবাহিত হয়। হিংস্র জন্তু সেই স্পন্দনের অন্তর্ভুক্ত হইলে সেও শান্তভাব ধারণ করে। ইহা শুধু ধ্রুবের বিষয় বলিতেছি না, অনেক সিদ্ধ যোগীর গল্পেও আছে।

অশরীরী প্রলোভন (Allurement by divine nymphs)—অনেক গ্রন্থে দেখা যায় যে, এক যোগী তপস্যা করিতে করিতে বেশ উন্নতি লাভ করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য হইল, এবং অশরীরী অপ্সরী (divine nymph) আসিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। এই ভাবটি নানা দেশে নানা ভাবে প্রচলিত আছে। কেন ইহা হয়? তপস্যা বা সাধনা করিতে

করিতে মনটা অনেক পরিমাণে উপরে উঠিয়া যায়। সেখানে উঠিয়া বেশ একটু আনন্দ পায় ও স্থিরভাবে থাকে। কিন্তু ভিতরকার বাসনা প্রচ্ছন্ন ও অলক্ষিতভাবে ঠিক রহিয়াছে, তাহারা পূর্বজন্মের বাসনা হইতে পারে। যাহা হউক, সেই সকল প্রচ্ছন্ন বাসনা প্রবলবেগে উঠিয়া পড়ে। কিছুকাল তপস্যা করায় স্নায়ু সকল সূক্ষ্ম হইয়াছে। অল্পেই তাহারা স্পন্দিত হইয়া উঠে। এইজন্য পূর্ববাসনা বা পূর্বস্মৃতি একটু জাগ্রত হইলে স্পষ্টভাবে রূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। বাহির হইতে অপ্সরী আসিতেছে না, উহা নিজের ভিতরের প্রবৃত্তি। চিদাকাশে রূপ ধারণা করিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়া চিদাভাস হয়। প্রত্যেক সাধকের নিজের পূর্ব জীবন অনুযায়ী, সামাজিক বেষ্টন অনুযায়ী সেই প্রতিবিম্বিত চিত্র তাহার সম্মুখে থাকে। এইজন্য দুই ব্যক্তির অপ্সরী দর্শন এক প্রকারের হয় না। বুদ্ধের মারের আক্রমণ একপ্রকারের হইয়াছিল। যীশুর প্রলোভন আর এক প্রকারের হইয়াছিল। কিন্তু সবগুলি নিজের ভিতর হইতে উৎপন্ন হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

বাসনার বীজ পুড়াইয়া ফেলা—(To fry the seeds of desire) তারপর স্বামিজী বলিতে লাগিলেন—খুব উচ্চ অবস্থায় উঠিতে হইলে বাসনা একেবারে ত্যাগ করিতে হয়। To use the language of the Yogi, "To fry the seeds of desire" অর্থাৎ বাসনার বীজ ভাজিয়া ফেলিবে। বীজ থাকিলে অঙ্কুর উঠিবে। কিন্তু সেই বীজকে যদি একেবারে ভাজিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আর অঙ্কুর হইতে পারে না।

উচ্চ অঙ্গের যোগীর পক্ষে এইটা বিশেষ আবশ্যকীয়। কারণ বাসনা হইতে এই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে, আবার সেই বাসনাতেই মানুষ আবদ্ধ হইতেছে। বাসনাই জগৎ-সৃজক্। স্বামিজী সেই রাত্রে খুব উত্তেজিত ও তেজঃপূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন। সকলেই স্থির ও নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ভাব্য বা ভাবের দিকে কাহারও

বিশেষ লক্ষ্য রহিল না, মন যেন একেবারে উপরে উঠিয়া যাইতেছে, সকলে এইটা অনুভব করিতে লাগিলেন।

* [বুদ্ধ যখন গৃধ্রকূট পর্বতে তপস্যা করিতে গিয়াছেন, তখন তিনি বোধিসত্ত্ব বা ব্রহ্মচারী, তখন তাঁর মনে এই ভাব উঠিয়াছিল।] *

"ক্ষুৎ-পিপাসা প্রথমশ্চৈব কামশ্চ দ্বিতীয়স্তথা।
সংশয়ঃ তৃতীয়শ্চৈব অহঙ্কার চতুর্থশ্চ॥"

তখন তিনি এই ভাবিতে লাগিলেন—আমি কি করিতেছি, রাজ্য সংসার অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি, ভিক্ষা করিয়া খাই, যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকি, কিন্তু কি হইল? ভিতরে আবর্জনা সবই রহিয়াছে। তারপর তিনি বলিতে লাগিলেন—So long a Sramana has the least tinge of desire in him, he can not attain Nirvana and what I am doing, nothing but this. বাসনার যদি একটী বীজ মাত্র থাকে, তাহা হইলে সে পূর্ণ অবস্থা পাইতে পারে না। আমার ভিতরে বাসনার সেই বীজ রহিয়াছে। ইহার পর তিনি উরুবিল্ব বা বুদ্ধ-গয়ায় গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর লেকচারে বাসনার বীজ পুড়াইয়া ফেলা আর বুদ্ধের উপখ্যানটীতে খুব সামঞ্জস্য, সেইজন্য এইস্থানে প্রদত্ত হইল।] *

Miss Mullerএর নিকট স্বামিজীর ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ—Miss Muller তিনটি ভাষা বিশেষরূপে জানিতেন—ইংরাজি, ফরাসী ও জার্মাণী ভাষা। একদিন অপরাহ্নে স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন—Give me lessons in French—আমাকে ফরাসী ভাষাতে পাঠ দাও। কারণ ইউরোপের বিভিন্ন অংশে গমনাগমন করিতে হইলে এবং কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে ফরাসী ভাষা-জ্ঞান অতি আবশ্যকীয়।

* টীকা—গ্রন্থকার।

বহুদেশের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহিত স্বামিজীকে কথাবার্তা বলিতে হইত। এইজন্য ঐ ফরাসী ভাষা জানা তাঁহার বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, এবং আশ্চর্যের বিষয় তিনি উহা উত্তমরূপে শিক্ষা ও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। বর্তমান লেখককেও তিনি ইহা শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য হন নাই।

Miss Mullerএর-গৃহে পরিচারিকার অন্ন-রন্ধন বিষয়— বাড়ীর বুড়ী ঝির উপর Miss Muller খুব চটিয়া গিয়াছিলেন। সব সময়েই তার রান্না অপছন্দ হইত। কিছুদিন পরে তিনি একটি নূতন ঝি আনিয়া সকলকে বলিলেন, "এখন যে এসেছে, সে মস্ত বড় রাঁধুনি। এমন সুন্দর রাঁধিয়ে আর পাওয়া যায় না।" সুখ্যাতির অন্ত নাই। সকলেই নিস্তব্ধভাবে রহিয়াছে, কাহারও কিছুই বলিবার সাহস নাই। তিনি নিজেই বলিলেন, "চমৎকার ভাত রাঁধতে পারে।" এই কথায় Sturdy জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ?" তখন মহা হর্ষিত হইয়া বলিলেন, "কেন? একটা হাঁড়িতে জল দিয়ে আগুনের ওপর সে বসিয়ে দেয়, আর জলটা যখন খুব ফুটে ওঠে, তখন চালগুলো একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে ওর ভেতর ফেলে দেয়। তখন চালটা সিদ্ধ হয়ে গেলে চালের পুঁটলিটা তুলে নিয়ে ভেতরকার জলটা ঝরে যাবার পর দেখা যায় কি সুন্দর ভাত রাঁধা হয়েছে।" উপস্থিত ভারতীয় শ্রোতাগণ (লেখক ও সারদানন্দ স্বামী) এই অদ্ভুত প্রণালীর অন্ন-প্রস্তুতের কথা শুনিয়া অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ধন্য রাঁধুনি, পুঁটুলি করে ডাল ভাত রাঁধা!" কিন্তু কলহের ভয়ে প্রকাশ্যে কেহ কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না।

পার্লামেণ্ট দেখা—একদিন প্রসঙ্গ হইল—পার্লামেণ্টে India Bill বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হইবে। Foxএর দেখিবার ইচ্ছা হইল। পার্লামেণ্টের অনুমতি পত্র ভিন্ন ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। Goodwinএর জনৈক পরিচিত ব্যক্তি সভ্য থাকায়

এবং তাহার নিকট হইতে অনুমতি পত্র পাইতে পারিবে জানাইলে, বর্তমান লেখকও উহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যথা সময়ে একদিন অপরাহ্নে Goodwin ঐ অনুমতি পত্র লইয়া Fox ও বর্তমান লেখককে সঙ্গে করিয়া পার্লামেণ্ট দেখিতে গমন করিল।

প্রথমে ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া একটি অপ্রশস্ত সরু গলি উত্তীর্ণ হইলে একটি দ্বৌবারিক (Gentleman usher), বুকে ফিতা লাগান ও তক্‌মা বাঁধা, অনুমতি পত্র দেখিতে চাহিল। পত্র পাঠে স্পিকারের সম্মুখে উপরের গ্যালেরীতে সকলের বসিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দিল। স্পিকারের সম্মুখে একটি টেবিল থাকে, উপরে রাজচিহ্ন বা রাজমুকুট শোভা পাইতেছিল। প্রধান স্পিকারের ডানদিকে মন্ত্রীবৃন্দ ও তাহাদিগের অনুগত লোক সকল বসিয়াছিল এবং বামদিকে বিপরীত দলের লোক সকল অবস্থান করিতেছিল। আর সম্মুখে কতকগুলি বেঞ্চিতে সদস্যদিগের বসিবার স্থানে জন-কতক ছিলেন, অর্থাৎ এইদিনে ঘরটির তিনদিকেই অল্পবিস্তর লোক বসিয়াছিল। হল ঘরটি বিশেষ বড় নয়। যেরূপ ইহার নাম, সেরূপ সুসজ্জিতও নয়। দেওয়াল প্রস্তর নির্মিত, জানালা সকলে রঙ্গিন কাঁচ—বহুপ্রকার মানবের প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করা, এইজন্য গৃহে বাহির হইতে অল্প আলো প্রবেশ করিয়া থাকে। যে সকল বক্তা পূর্বে স্বীয় নাম পাঠাইয়া দেন, দ্বৌবারিক তাঁহাদিগের নাম আহ্বান করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকেই উপস্থিত-বক্তা আছেন। বাগবিতণ্ডা সমাপ্ত হইলে সকলেই পশ্চাতের একটি গৃহে গমন করিয়া থাকে। এই দিনেও এইরূপ হইয়াছিল। পরে দুই ব্যক্তি ঐ গৃহ মধ্যে যাইয়া লোকসংখ্যা গণনা করিয়া আসিল এবং পুনরায় বাহিরে আসিয়া সভাপতির টেবিলের নিকট কিছু দূরে সসম্ভ্রমে একত্রে দণ্ডায়মান হইল। পরে তাঁহার অনুমতি পাইলে, উভয়ে একসঙ্গে সমপদ-বিক্ষেপে নমস্কার করিতে করিতে স্পিকারের নিকট গমন করিয়া নীরবে নতশিরে অবস্থান করিতে লাগিল। পুনরায় অনুমতিক্রমে

স্পষ্টভাবে গণনা সংখ্যা জ্ঞাপন করিল। যাহারা চলিয়া যাইতেছে, সকলেই স্পিকারকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

পার্লামেণ্ট গৃহ দেখিবার সাধারণ দিবস শনিবার। এইদিনে বৈঠক হয় না। পুলিশের লোক ঐ বাড়ীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থান-পূর্বক দর্শকদিগকে বিশিষ্ট স্থান সমূহ বুঝাইয়া দেয়। লণ্ডনের শান্তিরক্ষকেরা এই দেশের (ভারতবর্ষের) মত নহে। সর্বদা সকলের সহিত ভদ্র ও সৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। House of Commons নামক অপর বাড়ীর চারিদিকে চারিটী দ্বিতল গ্যালারী আছে, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের বসিবার স্থান আছে।

স্পিকারের বসিবার চেয়ারের পার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়া একটি বড় ঘরে যাওয়া যায়। নরম সুদৃশ্য মখমলাবৃত বেঞ্চে গৃহটি সজ্জিত। House of Commonsএর বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলে দেখা যায় যে, একটি সুন্দর মখমল দেওয়া চেয়ার এবং মঞ্চের তিনদিক একটি রেশমের দড়িদ্বারা পরিধি নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহাই রাজসিংহাসন এবং এই গৃহটিকে "House of Lords" বলা হয়।

সিংহাসনের সামনে একখানি বেঞ্চের উপর ভেড়ার লোমপূর্ণ একটি ছোট গদি আছে। ইহাকে wool sack বা পশমের গদি বলা হয়। ইহাতে দেওয়ান বা Chancellor বসিয়া থাকেন। এইজন্য তাহাকে Lord Woolsack বলা হয়। কারণ পূর্বে ইংলণ্ডে ভেড়ার পশম হইতে রাজকর আদায় হইত। সকলে সিংহাসনের নিকট গমন করিলে, প্রহরী সকলকে মস্তক হইতে টুপি খুলিতে অনুরোধ করিলে, প্রত্যেকেই সসম্ভ্রমে এই আদেশ পালন করিল। পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া নিকটে আসিলে একটি লম্বা হল ঘরে যাওয়া যায়। ইহা, যে ঘরে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিচার হইয়াছিল, তাহার বামদিকে অবস্থিত। ইহা পূর্বে রাজা Rufasএর 'হলঘর' নামে পরিচিত ছিল। অন্যান্য

স্থানে জনসাধারণের প্রবেশ অধিকার না থাকায় তাহার বিষয় বলা অসম্ভব।

পার্লামেণ্ট গৃহে কয়েকটি চিত্রের কথা বিশেষভাবে স্মরণ হইতেছে। যথা, Lord Chatham বক্তৃতা করিতে করিতে পড়িয়া যাইতেছেন। George IV-এর রাণীর বিবাহ-বিচ্ছেদ (divorce), Willberforce slavery বা দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য বক্তৃতা করিতেছেন। তিনখানি চিত্রই আকারে বৃহৎ।

পার্লামেণ্ট দেখিয়া সকলে ফিরিয়া আসিলে, স্বামিজী নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হইতেছে ইহা উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন।

Foxএর সহিত রাজনীতি চর্চা—Fox একদিন রাজনীতির কথা তুলিল। সে একজন আমেরিকান্ ও রিপাবলিকান্, শ্লেষভাবে সে বলিল, "ইংরাজদের রাজ্য শাসন প্রথাটা অতি বুড়োটে—অতি প্রাচীনকালের ঢং। এই জাতটা আমাদের জাতের ৫০ বছর পেছনে পড়ে রয়েছে। এরা বড় রক্ষণশীল—কোনও একটা নূতন ভাব টপ্ করে শীঘ্র নিতে চায় না। যখন সমস্ত জগতে কোনও একটা নূতন ভাব নিয়েছে, ইংরেজরা তখনও বিবেচনা করে যে এটা নেওয়া যেতে পারে কি না। এর একটা কারণ হ'তে পারে যে, এই দেশটা ভারী স্যাঁতানো, কোয়াশা ও মেঘে সব সময়েই এটাকে ঘিরে রেখেছে, তাই এদের মনগুলোও যেন ভিজে, গরম হ'তে সময় লাগে। আর এইজন্যে আধুনিক পংক্তিতে ইংরেজরা ঢের পেছনে পড়ে রয়েছে। এদের আর একটা জাতিগত ব্যামো হ'য়েছে, যেটাকে বলে Land Hunger (জমির খিদে) বা ভূমিভূক্ হওয়া। পৃথিবীর যেখানে যত জমি পাবে, ন্যায়তঃ বা অন্যায়তঃ সেটাকে ওরা চেয়ে বসবে। এত মাইল জমি নিয়ে কি হবে? এটা শুধু জাতির দুর্বলতা, অমূলক গর্ব (Vanity)। অল্প জমি উন্নত করিলে বেশ সুফল হয়, আর ছড়ান অনেক

জমি দখল করে রাখলে জগতের শক্তিক্ষয় হয়ে যায়। জগতের সমস্ত উঁচু মনোবৃত্তি লোপ পেয়ে যায়। এর বিশেষ লক্ষণও দেখতে পাওয়া গেছে। আমেরিকায় বা অন্যান্য দেশে কত বড় বড় চিন্তাশীল লোক সব কত কাজ কর্‌ছে। জাতের ভেতর যে তেজঃপূর্ণ একটা প্রাণের চিহ্ন রয়েছে, তার পরিচয় দিচ্ছে; কিন্তু ইংরেজ জাতটার মধ্যে একটাও প্রখর-মস্তিষ্কের লোক দেখা দিচ্ছে না, জগৎকে আর কিছু নূতন ভাব দিতে পারছে না। এরা কেবলই দ্বৈধীভাবে (diplomacy) চূড়ান্ত হয়েছে। কথা বেচে দুর্বল জাতের ওপর প্রাধান্য করা চলে, কিন্তু শক্তিমান জাতের কাছে হটে আসতে হয়। যে জাত ইংরাজকে বিশ্বাস করে না, সেখানে পরাস্ত হ'তেই হবে। এখন সমস্ত জগৎটা নূতন ভাবের জন্য আমেরিকার দিকে চেয়ে রয়েছে। সঙ্গীত, সুর, চিত্র, দর্শন, কাব্য যা কিছু জগতে নূতন দেখা দেবে, সমস্তই আমেরিকা থেকে বার হবে। ইংলণ্ডের মত একটা পচা-পুরাণো দেশ থেকে আর কিছুই নূতন পাওয়া যাবে না। এ জাতটা একেবারে গোল্লায় গেছে—কোন উচ্চচিন্তা করবার এর এতটুকু ক্ষমতা নেই।"

সকলে চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল এবং স্বদেশ প্রেম কাহাকে বলে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল।

ইংলণ্ডের মেয়েদের শক্তিবিষয়ে বা ইংলণ্ডীয় নারীর স্বাস্থ্য—একদিন স্বামিজীর অতি প্রফুল্লভাব, গৃহে মধ্যে মধ্যে পদচারণা করিতেছেন, কখনও বা তামাক খাইতেছেন, কখনও বা নিজের চেয়ারটিতে ক্ষণিক বসিতেছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ইংলণ্ডের মেয়েগুলো কি সণ্ডা! রাস্তায়, পথে, সর্বত্রই তারা কেমন মরদের মত চলাফেরা ক'রে কাজ করে! ওদের মাংসপেশী-গুলোও খুব শক্ত। এরা যেন জাতটার একটা সুস্বাস্থ্যের নমুনা। তাই এদেশে যত ছেলেমেয়ে জন্মায়, তারাও এত তেজস্বী ও বলবান হয়। ২৫।৩০ বছরের আগে এরা বে করবে না। শরীরটা

বেশ সুস্থ রাখবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। এইজন্যে এদেশের মেয়েগুলোও এত সবল ও তেজী হয়। আর যে সব বাপ মা রোগা, অপটু; তাদের ছেলেগুলোও এইরকম রোগা, লিক্‌লিকে ও ক্ষণজীবী হয়। দেহটাকে খুব সবল ও স্বাস্থ্যবান ক'রে তবে বে করতে হয়। ভারতবর্ষের জাতটাকে খুব সবল করা দরকার। তা করা হয়নি বলেই ওদেশের ছেলেদের মস্তিষ্ক দুর্বল ও সদাই বিষণ্ণভাবে পূর্ণ। ইংরেজের মত ঐ জাতটাকে আশাবাদী করা বিশেষ আবশ্যক। এই নিরাশবাদী ভাব থেকেই হিন্দু জাতটা মারা যাচ্ছে। আশান্বিত হলে তখন এরা জগতে অনেক কাজ করতে পারবে।"

স্বামিজী উত্তেজিত হইয়া এইভাবে বহু কথা বলিলেন। কথাগুলি গভীর চিন্তাপূর্ণ ও ভাবগ্রাহী হইয়াছিল, কারণ তখন তিনি মানসিক যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন।

আমেরিকাবাসী নারীগণের কর্ম্মতৎপরতা, চটপটে ভাব—স্বামিজী একদিন বলিতে লাগিলেন, "আমেরিকার মেয়েরা কি চটপটে! তারা মেয়ে নয়, যেন মদ্দ। এই বাজার যাচ্ছে, জিনিষ কিনছে, হিসাব রাখছে, ব্যাঙ্কে যাচ্ছে, টাকা ভাঙ্গিয়ে আনছে। এই বাসে চ'ড়ে, গাড়ী ক'রে—এখানে যাচ্ছে, ওখানে চলেছে। কি চমৎকার চটপটে! পুরুষগুলোকে হার মানিয়ে দিচ্ছে। মেয়েলিভাব এদের মধ্যে এতটুকু নেই, সব যেন মদ্দা। আর এই হিসেবে ইংলণ্ডের মেয়েগুলো যেন ঢিব্‌সি। কোন কিছু কাজ করতে হলে, একলা বাইরে যেতে হ'লে ভয়ে মরে। এরা ওদের মত অত চালাক-চতুর নয়—তেজী নয়। আমেরিকার মেয়েদের কাছে ইংরেজদের মেয়েরা যেন ৫০ বছর পেছিয়ে পড়ে রয়েছে। ইংলণ্ডের মেয়েগুলো যেন একান্ত সেকেলে, অতি পুরানো চালে চলে। আর নূতন রিপাবলিক দেশ আমেরিকায় পুরুষও টাকা উপায় করছে, মেয়েরাও রোজগার করছে। তাই

এরা অত চন্‌মনে। মেয়েগুলোর চালচলন দেখলে মনে একটা সাহস আসে, বুকে একটা বল হয়। হ্যাদ্‌নেদে ট্যাপসা ভাব এদের মোটে নেই।" সকলে চুপ করিয়া তাঁহার কথা শুনিল।

গঙ্গাধর মহারাজের তলোয়ারের মত নাক—একদিন স্বামিজী Sturdyকে বলিলেন, "ছ্যাখ্, তিব্বতের লোকেরা মংগলিয়ান জাত। অমন ধারা শূঁড়ের মত লম্বা নাকওয়ালা লোক জগতে প্রায় দেখা যায় না। বরাহনগরে যখন থাকতুম, তখন গঙ্গাধর অল্প বয়সে এখান হ'তে তিব্বতে চলে যায়। সেখানে তার লম্বা নাক দেখে সকলেই খুব যত্ন করতে লাগল। আমরা তাকে ঐ লম্বা নাকের জন্য খুব ঠাট্টা করতুম। তিব্বতের লোকেরাও ব'লত, 'নাকটা কি লম্বা, ঠিক যেন একটা তলোয়ারের মত'," এই কথা বলিয়া তিনি নিজের নাকের নিকট একটা আঙ্গুল দিয়া আকার দেখাইয়া সকলকে হাসাইতে লাগিলেন।

Sturdyর সহিত রহস্যালাপ, ফষ্টিনাষ্টি—স্বামিজী ইচ্ছামত গম্ভীর হইতে পারিতেন অর্থাৎ যখন আবশ্যক হইত, তখন এরূপ গম্ভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকিতেন যে কেহই তখন তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিত না। আবার যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতেন তখন সকলের সহিত নানা প্রকার রঙ্গ করিতেন। একদিন প্রাতে স্বামিজী নিজের চেয়ারে বসিয়া আছেন, অদূরে Sturdy জানালার নিকট একটি চেয়ারে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া আছে। Sturdyর সহিত তিনি তখন এরূপ ফষ্টিনাষ্টি বা রহস্যালাপ করিতে লাগিলেন যে সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামিজী কিছু মাত্র সঙ্কোচ না করিয়া অনবরত ঐ ভাবে কথাবার্তা কিছুকাল চালাইলেন। উহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি লোকের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন যাহাতে কেহই তাঁহার কোনও কথায় বা কার্যে দোষ লইত না। তিনি এরূপ সাদাসিদা লোক ছিলেন যে মনের কথা মুখে ব্যক্ত করিতে

এতটুকু দ্বিধা বোধ করিতেন না। কিন্তু মনে কিছুই স্থায়ীভাবে রাখিতেন না।

কাল আঙ্গুর খাওয়া—গ্রীষ্মকাল, হাওয়াটাও একটু গরম বোধ হইতেছিল। বেলা সাড়ে তিনটার সময় বর্তমান লেখক নীচেকার ঘরে যাইয়া দেখিলেন যে স্বামিজী একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। বর্তমান লেখককে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "কাঁচের পাত্রে কাল আঙ্গুর রয়েছে। এটা নতুন উঠেছে। খা, খুব গোটাকতক খা। আঙ্গুর খেলে গায়ের রক্ত পরিষ্কার হয়।" এই বলিয়া নিজে উঠিয়া ঐ পাত্র হইতে আঙ্গুর দিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "নে, নে, খেয়ে নে, বেশ ভাল জিনিষ। রক্ত পরিষ্কার হবে।" সেদিন তাঁহার বেশ প্রফুল্ল ভাব ছিল।

গলার টাই বা কলার বিষয়ে উপদেশ—একদিন বৈকাল বেলা চারিটার সময় Goodwin আসিয়া লেখককে স্বামিজীর নিকট যাইবার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। লেখক তখন সবেমাত্র বহির্ভ্রমণ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া মুখাদি ধৌত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আদেশ পাইয়া, কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া লেখক ঐ অবস্থাতেই স্বামিজীর নিকট ত্বরিতপদে গমন করিলেন। গৃহে তখন চার পাঁচজন আগন্তুক ভদ্রলোক স্বামিজীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। আগন্তুক থাকায় কথাবার্তা ইংরাজি ভাষাতেই হইল। কারণ গৃহে অপর ভাষা জানা লোক থাকিলে, যে ভাষা সকলের পরিচিত উহাতেই কথা বলা আবশ্যক। সভ্যতার ইহাই বিশিষ্টতা। অন্য ভাষায় কথা বলা তখন দূষণীয়। আবশ্যকীয় কথা শেষ হইলে, লেখকের গলার টাই ও কলার না থাকায় এবং মস্তকের কেশ বুরুস দ্বারা পরিষ্কৃত হয় নাই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "এরূপ অবস্থায় ঘরে আসা ঠিক নয়। কলার এক সপ্তাহ ব্যবহার করতে নাই, অন্ততঃ সপ্তাহে উহা দু'বার বদলান উচিৎ। ময়লা কলার ব্যবহার করিলে দেখতে খারাপ হয়। সর্বদা চুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

রাখবে। কোট, ভেষ্ট প্রভৃতি সর্বদা পরিষ্কার রাখবে। ভদ্র-পরিচ্ছদ, ভদ্র আচার এইটিই প্রথম বিষয়। তা না হ'লে লোকে ঘৃণা করে।" লেখক অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া আসিলেন। স্বামিজীর সর্ববিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

রম্‌তাসাধু অবস্থায় স্বামিজীর মনোভাব—রম্‌তাসাধু অবস্থাকালে পূর্ব কথা স্মরণ করিয়া Sturdyর নিকট আত্ম-কথা প্রকাশ করিয়া একদিন স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "যখন রম্‌তাসাধু ছিলাম, তখন খাওয়া দাওয়ার বিশেষ কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম, কত লোকে কত দুর্বাক্য বলত, চুপ করে কেবল শুনে যেতাম। আর মনে মনে তখন ভাবতাম—আমার নিজের ত এই অবস্থা। আর ভদ্রলোকের ছেলেগুলোকে যে তাদের বাড়ী থেকে বার করে সন্ন্যাসী করলুম, বরাহনগরে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে রেখে এলুম, তাহাদের ত খাবারের কোনও বন্দোবস্ত নেই। ভদ্রঘরের ছেলে পথের ভিখারী হোল, তাদেরই বা কি অবস্থা হবে? আবার তারা এখন কি অবস্থায় রয়েছে, তার কিছুই জানতে পারছি না। আবার কখনও নিজের দেশের কথা (ভারতবর্ষের বিষয়) ভাবতুম—সেখানে চারদিকে কি হাহাকার, কি দৈন্য, কি কষ্ট! এই রকম নানা চিন্তায় মনে বড়ই কষ্ট হোত। কিন্তু আমি তখন সম্পূর্ণ নিরুপায়, কোন কিছুই করবার আমার ক্ষমতা নেই। সব বিষয় ভাবছি, চোখে দেখছি, আর মুখ বুজে চুপ করে রয়েছি। এ ছাড়া তখন আর অন্য কি উপায় ছিল? তখন বড় মানসিক যাতনায় কষ্ট পেতাম, কোনও পথই খুঁজে পেতাম না। এক একদিন এমন যাতনা হোত, মনে হোত যেন বুকটা ভেঙ্গে গেল। জীবনটা যেন ব্যর্থ বলে বোধ হোত। মনের ভাবের কথা কাউকে কিছুই বলবার নয়, তাই নিজেই যন্ত্রণা সহ্য করতাম।" এইরূপ পূর্ব কথা ও মানসিক যন্ত্রণার

বিষয় বহুক্ষণ আলোচনা করিয়া তিনি শোকার্ত ও বিষণ্ণভাবে রহিলেন।

কাবালা বিষয়ে—Sturdyর সহিত একদিন স্বামিজী ইহুদিগের ধর্মগ্রন্থ 'কাবালা' বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। ঐ গ্রন্থের নানাস্থানের কথা তুলিয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। লেখকের ঐ বিষয়ে বিশেষ জানা না থাকায় তিনি ঐ সকল কথা সবিশেষ ধরিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতির ধর্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর গভীর অধিকার ছিল।

স্বামিজীর আনন্দে নৃত্য করা—একদিন স্বামিজী বেশ প্রফুল্ল—আনন্দে যেন বিভোর। একেবারে বালকের মত সরল ভাবে আনন্দ-মগন। ঐ দিন নীচেকার ঘরে তখন বাহিরের কোনও লোক ছিল না—নিতান্ত কয়েকটি অন্তরঙ্গ বর্তমান। লেকচার-টেবিলটার নিকট দাঁড়াইয়া স্বামিজী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার এই বালকোচিত আচরণে সকলেই বিস্ময়ে ও আনন্দে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—"রাজযোগ" বক্তৃতাকালে ইনিই অতি গম্ভীর ভাবে গভীর তত্ত্ব-কথা ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করেন।

কথাপ্রসঙ্গে হিন্দি ভাষার কথা উঠিলে, স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "সাধারণ বাঙ্গালীর চাকর, মুটে, দ্বারোয়ান, গাড়োয়ান যে হিন্দি ভাষা শেখে, সেটা একেবারেই পশ্চিমা ভদ্রলোকের ভাষা নয়। এটাকে 'গাড়োয়ানী হিন্দি' (Cabby Hindi) বলে।" এই কথা বলিয়া তিনি ঐ চলিত হিন্দি কথা ব্যবহারের নমুনা বলিয়া অনেক হাস্য কৌতুক করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিলেন, "দেখ, প্রকৃত হিন্দি ভাষা একটা স্বতন্ত্র ভাষা, এতে অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে। আবার অনেক আরবী ও পারসী শব্দও এতে রয়েছে। ঐ ভাষাটা যদিও উত্তর ভারতবর্ষের অনেক দেশেতে চলে, কিন্তু এর একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারা আছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এই ভাষাটার কিছু অদল বদল করে

চলন আছে।" এইরূপে ঐ হিন্দি ভাষা বিষয়ে তিনি অনেক কথা বলিলেন।

রাজপুতদিগের বস্ত্র পরিধান বিষয়ে—আর একদিন প্রাতে রাজপুতদিগের কথা উঠিল। ক্রমে উহাদিগের বস্ত্র-পরিধান বিষয়ে কথা হইল। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "বাঙ্গালীরা ধুতি পরে বটে, কিন্তু কাছা কোঁচা এমনভাবে দেয় যে, একটু হাওয়া লাগলেই তাদের কাপড়টা বে-সামাল হয়ে যায়, সামান্য হাওয়াতেই উড়তে থাকে। ঐভাবে কাপড় পরলে, দৌড়ে যাবার যো নেই। একটা ষাঁড়ে যদি তাড়া করে, তা'হলেই মহা মুস্কিল। বাঙ্গালীদের এইরকম ভাবে কাপড় পরাটা একটা লট্‌বহরা (paraphernalia), এতে কোন কাজ করবার উপায় নেই, কিন্তু রাজপুতদের ধুতি পরার কায়দা বেশ সুন্দর। কাছাটা পায়ে এমন জড়িয়ে নেয়, যেন ঠিক ইজের পরেছে। কাজকর্ম করতে, দৌড়ঝাঁপ করতে এদের কত সুবিধা।" এই কথা বলিয়া তিনি স্বয়ং দাঁড়াইয়া স্বীয় পেণ্টালুনের (pantaloon) উপর হাত ঘুরাইয়া রাজপুতদিগের কাপড় পরিবার ও কাছা দিবার প্রণালী সকলকে দেখাইলেন। পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেবতার সামনে ও রাজার সুমুখে নিজের পা বার করে আমাদের দেশের লোক বসে না। শাস্ত্রেও এই বিষয়ে নিষেধ আছে। দেবতাকে ও রাজাকে নিজের পায়ের নীচু দিকটা দেখান উচিৎ নয়। তাই চুড়িদার পায়জামা পরবার প্রথা। তা না হ'লে ধুতিটাই এমনভাবে পরতে হয়, যাতে শরীরের অধোভাগটা না দেখা যায়। তাই ঐ সময়ে নিজের পা ও নিকটস্থ অংশ বেশ মুড়ে আবৃত করে বসতে হয়। প্রাচীন শাস্ত্রে এই বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ আছে। বাঙ্গালা দেশে ধুতি পরার প্রথাটা পরিবর্ত্তন করা খুব দরকার। কাপড়-চোপড় (পরিচ্ছদ বা বেশভূষা) এমনভাবে পরতে হবে, যাতে বুকে একটা জোর আসে, লোকটা চন্‌মনে হয়। তা না করে এলোমেলোভাবে কাপড় পরলে, লোকটা অকর্মণ্য

হয়ে পড়ে, তার কোন বিষয়ে উদ্যম থাকে না, ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যায়।” এইরূপ কথা হইতে বুঝা যায় যে, স্বদেশের মঙ্গল চিন্তা তাঁহার চিত্তে সদাই জাগরিত ছিল।

সারদানন্দ স্বামীর ম্যালেরিয়া জ্বর—ইংলণ্ডে বর্তমান লেখক যখন প্রথম গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জ্বর হইত এবং সারদানন্দ স্বামী তাঁহার সহিত একত্র শয়ন করায় তিনিও ঐ জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। একদিন প্রাতঃভোজন করিয়া লেখক বেড়াইতে গেলেন এবং বৈকাল বেলায় গৃহে ফিরিলেন। সারদানন্দ স্বামীর ঐ দিন জ্বর ছিল সেইজন্য ভ্রমণে যাইতে পারেন নাই। মধ্যাহ্নে জ্বরের বৃদ্ধি হইল। বাতিকের জর—তাই মাথার যন্ত্রণা হইতেছিল, কষ্টে তিনি চিৎকার করিতে লাগিলেন। Sturdy তখন বাড়ীতে ছিল। রোগীর কাতরতা দেখিয়া বিশেষ ভীত ও চিন্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ অনেক চিকিৎসক আনাইয়া উহার তত্ত্বাবধান করিতে সে ব্যস্ত হইল। ম্যালেরিয়া জ্বর কিরূপ, তাহার বিষয়ে পুর্বে বোধ হয় সে কিছুই জানিত না এবং ইংলণ্ডের ডাক্তারগণও এই ব্যাধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। পুস্তকেই তাঁহারা এই বিষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন, চাক্ষুষ কখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। ইহা যে কেবল ভারতে—বিশেষতঃ বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে ঘরে ঘরে নিত্য নৈমিত্তিকভাবে চিরস্থায়ী অভিসম্পাতরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহা ঐ দেশের লোকের পক্ষে জানা অসম্ভব। নানা বৈদ্যের মতে নানাপ্রকার প্রেশক্রপশান্ অনুসারে রকমারি শিশিতে ও বোতলে ঔষধ আসিল—যেন একটি ছোট ঔষধালয়ের (ডাক্তারখানার) সৃষ্টি হইল। ডাক্তারের ফি ও ও ঔষধের মূল্য বাবদে প্রায় ১২।১৪ পাউণ্ড খরচ হইল। লেখক ঐ দিন গৃহে উপস্থিত থাকিলে ততটা বাড়াবাড়ি হইত না। বেলা চারটার সময় তিনি ফিরিয়া আসিয়া গৃহের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিয়া তখন সারদানন্দ স্বামীকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার জ্বরটার বেগও কম ছিল, কিন্তু অতি দুর্বলভাবে বিছানায়

শয়ন করিয়াছিলেন। মৃদুস্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওহে, আজ দুপুরবেলায় জ্বরের মাত্রাটা কিছু বেশী হয়েছিল, আর মাথার যন্ত্রণার জন্য খানিক হৈ চৈ করেছিলুম। বাতিকের জ্বর—তুমিও তখন বাড়ী ছিলে না। Sturdy অত্যন্ত ভয় পেয়ে, বড় বড় ডাক্তার এনে ওষুধে ছয়লাপ করে ফেলেছে। শুন্‌লাম নাকি এতে ১২।১৪ পাউণ্ড খরচাও হয়ে গেছে। দেখদিখিনি, অকারণে এত খরচা করা আর এত হৈ চৈ করা কেন? আমার ত এখন ভারী লজ্জা করছে। একেই ত এরা আমাদের কত করছে, তার ওপর আবার এই রকম উৎপাত হোল! আমি আর কি করব বল? Sturdy নিজেই এই সমস্ত বন্দোবস্ত করলে। তুমি থাকলে কিন্তু এতটা গড়াত না। এখন আমার ভারী লজ্জা করছে।"

এইরূপ কথা চলিতেছে—কিছু পরে স্বামিজী ঐঘরে প্রবেশ করিয়া লেখককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ দুপুরে তুই কোথায় গেছলি? শরতের জ্বর হোল, শালা অস্থির! একটু জ্বরেই চেঁচামেচিতে সারা বাড়ীখানা মাথায় করে তুললে। ১২।১৪ পাউণ্ড খরচা করিয়ে দিলে। আর লোকেরাও অতিষ্ঠ ও উত্যক্ত হয়ে গেল। ও-শালার জ্বর যতদিন না ভাল হয়, তুই ওর কাছে থাকিস। আবার কখন ওর জ্বর হবে, শালা আবার আর একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবে। শালা একটা ম্যালেরিয়া রোগী, বাতিকের জ্বরে চেঁচায় দেখ!" সারদানন্দ স্বামী এই সস্নেহ তিরস্কারকালে বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া বিছানাতে স্বীয় দেহ গলা পর্যন্ত কম্বলে আবৃত করিয়া চক্ষু পিট্‌পিট্ করিয়া শুইয়া রহিলেন, কোন বাক্য বলিলেন না। কিছু পরে স্বামিজী অন্যত্র গমন করিলে, উভয়ে হাস্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে জ্বর ছাড়িলে, তিনি সহাস্যে বলিতে লাগিলেন, "আমরা ম্যালেরিয়া-দেশের লোক, বারোমাসই ঐ অসুখে ভুগি—এটা আমাদের বেশ গা-সওয়া হয়ে গেছে; কিন্তু এদেশের লোকেরা ত কখনও এ রকম দেখেনি, তাই ভয়ে এরা এত গণ্ডগোল বাধালে।"

ভারতের লোক অল্পাহারী—একদিন স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "আমেরিকার লোক খাবে একটু, কিন্তু নেবে এতটা! দু'এক চামচে খাবে, আর বাকিটা ফেলে দেবে। আবার তরবেতর খাবে। লোকগুলো যেমন খায়, তেমনি পরিশ্রমও করতে পারে। আবার তেমনি টাকাও রোজগার করে। তাইতে ওরা অতদিন ধরে বাঁচে আর প্রফুল্ল থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষের লোকগুলো কত অল্প খেয়ে কি করে বেঁচে আছে? আধপেটা সিকিপেটা খেয়ে কি করে ওরা প্রাণ-ধারণ করে থাকে? ওদের সাহস নেই, উদ্যম নেই, সব সময়েই বিষণ্ন, হতাশ। জগতে যে তারা কিছু করতে পারে একথা তাদের ধারণাতেই আসে না। তাদের ভেতর যে মহাশক্তি রয়েছে, সেটা তারা ভুলে গেছে। কেবল মৃত্যুকেই তারা সামনে দেখছে, আর বিরস হয়ে বসে আছে। একটা নূতন কিছু তৈরী করবার মত শক্তি তাদের নেই। জাতটার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে গেছে। জাতটা কি শেষে মরে যাবে নাকি? এই কথা অনেক সময় আমি বসে ভাবি। আর এই আমেরিকানদের বিষয় চিন্তা করি। এই দুটো জাতের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! একটা জাত বলছে, নিজের শক্তিতে সব প্রতিবন্ধক ভেঙ্গে চূরমার করে নিজের পথ বার করে চলে যাব, আর একটা জাত নিরাশ হতাশভাবে বলছে, 'কি হবে? কি করে করব?' দুখচেটে খাওয়াটাই হচ্ছে এই অধঃপতনভাবের প্রধান কারণ। দুখচেটে (wretched) খায়, দুখচেটে থাকে, তাই জাতটা এত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।" এইভাবে উত্তেজিত হইয়া তিনি ভারতের অবনতির বিষয় বলিতে লাগিলেন। সকলেই বিস্ময়ে দেখিল যে, তাঁহার বিশাল নয়ন-কোণে অশ্রু টলমল করিতেছে। মনের ভাবটা ভাষা দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টায় তাঁহার মুখমণ্ডলীতে ঐ ভাবটি যেন জীবন্তরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সকলেই তখন তাঁহার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

আমেরিকাবাসীদিগের জীবন্ত শক্তি বিষয়ে—আর এক-

দিন স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "আমেরিকার লোকগুলো কতদিন ধরে বাঁচে। ৮০।৯০ বছরের বুড়ো একটা জোয়ান ছোকরার মত সমানভাবে কাজ করছে। ওরা যে বয়সে বুড়ো হয়েছে, তা মোটেই খেয়াল করে না। এই ভাবটা তারা তাদের মন থেকে যেন একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে। স্বাধীন দেশ, সকলে মনের সুখে থাকে, সব বিষয়েই উৎসাহ, আর টাকাও বেশ হাতে সচ্ছল থাকে, তাই ওরা অনেকদিন ধরে বেঁচে জীবনকে ভোগ করে। মৃত্যুও যেন ওদের কাছে ঘেঁসতে ভয় পায়। ইংলণ্ডের লোকগুলোও অনেকদিন ধরে বাঁচে, নিজেদের দেহগুলোকেও সবল, সতেজ রাখে ; কিন্তু ভারতবর্ষের লোকগুলোর কি শোচনীয় অবস্থাই হয়েছে—অতি অল্পদিনের মধ্যেই মরে যায়। তাদের মুখে সব সময়েই একটা মহাভীরুতার চিহ্ন রয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন একটা জড়পিণ্ড, নিস্তেজ—কোন কাজে কোন উৎসাহ নেই, নিজে উৎসাহ ক'রে, চেষ্টা ক'রে নূতন কিছু করবার ইচ্ছেই নেই—আশা ও ক্ষমতাও নেই। তাই ওরা এত শিগ্‌গির মরে যায়। শেষে কি সত্যিই জাতটা মরে একদম নির্মূল হয়ে যাবে নাকি? কি কষ্ট। কি কষ্ট!" এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং অতি শোকার্তভাবে ও বিষণ্ণচিত্তে তিনি মৌনীরূপে বহুক্ষণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

India Office Library হইতে সংস্কৃত পুস্তক আনয়ন ও পাঠ—স্বামিজীর একখানি সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিবার ইচ্ছা হওয়ায় Sturdy উহা India Office Library হইতে আনয়ন করিল। উহা পাইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন—এই বইটার জন্য ভারতবর্ষে আমি অনেক খুঁজেছিলাম, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। Sturdy তখন ঐ India Office Libraryর কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিল, "এখানে অনেকরকম বই আছে, সংস্কৃত, পারসী, আরবী ইত্যাদি বহুপ্রকার ভাষার বহু পুস্তক এইস্থানে সংগৃহীত

আছে। জগতের মধ্যে এই লাইব্রেরীটা একটা বিখ্যাত পুস্তকাগার। এখানে সর্বসাধারণের প্রবেশ-অধিকার নাই। কোনও বিশিষ্ট লোকের পরিচিত না হইলে, এইস্থানে পুস্তক পাওয়া যাইতে পারে না।" এইভাবে ঐ India Officeএর Library বিষয়ে Sturdy যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতে লাগিল।

ভারতীয়গণের শুভ্রবর্ণ বিষয়ে—একদিন স্বামিজী বলিতে লাগিলেন—পূর্বে ভারতবর্ষের লোকের বর্ণ শুভ্র ছিল। বিখ্যাত গ্রীক পর্যটক মেগাস্থেনিস (Megasthenes) লিখিত পুস্তকে শুভ্র-ভারতবাসী (White Indians), এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচার হওয়ায়, নানা জাতির ও শ্রেণীর রক্ত সংমিশ্রণ হইয়াছিল—বিশেষতঃ তাতার ও ঐ শ্রেণীর রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ইহার পরই ভারতীয়গণের বর্ণের উজ্জলতা মলিন হইল। ইহাই হইল বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারের একটি দোষ।

Sturdyর ব্যাঙ্কের কথা—একদিন প্রাতে Sturdy এক ব্যাঙ্কের গল্প তুলিল। সে বলিতে লাগিল—ছেলেবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম, হাত-খরচার মত বাড়ী থেকে কিছু পাওয়া যেত। ছেলেদের খেয়াল হোল যে একটা ব্যাঙ্ক করতে হবে। একজন বালকের কাছে সকলের পয়সা একত্র করে জমা রাখা গেল। সে যেন আমাদের ব্যাঙ্কার, যখন যার যেমন আবশ্যক হোত, সে তখন ঐ ব্যাঙ্কারের নিকট হ'তে ধার নিতে পারত। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ঐ ঋণ পরিশোধ না হ'ত, ততদিন তাহাকে নিয়মমত সুদ দিতে হ'ত। ক্রমে ঐ স্কুলের ছাত্র অনেকেই উহাতে যোগ দিলে উহার কার্যও বাড়িল। কয়েক বছরের পর ঐ ছেলেবেলার সামান্য ব্যাঙ্ক বড় হ'ল। বাইরের অনেকেই উহাতে টাকা গচ্ছিত রাখিল। বর্তমানে উহা একটি বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক হয়েছে। এইরূপে সামান্য এই ব্যাঙ্কটী ছেলেখেলার মত সামান্যভাবে আরম্ভ হ'য়ে বর্তমানে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

* [এই ব্যাঙ্কে লেখক টাকা রাখিত এবং Sturdyও টাকা রাখিত। ভারতবর্ষের যুবক ও বালকদিগের এই ব্যাঙ্কের উপাখ্যানটি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়া উপলব্ধি করা আবশ্যক। কারণ এই গল্পটি হইল ইংরাজ-জাতির উন্নতির একটি বিশেষ মন্ত্র বা প্রাণ। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করা, সামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করা—ইহাই বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয়।] *

কণ্টিনেণ্ট ভ্রমণ—লণ্ডনে কিছুকাল অবস্থান করিয়া সর্বদাই লেকচার দেওয়ায় ও সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বামিজী অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায়, সকলের অনুরোধে বায়ু-পরিবর্তনে যাইতে মনস্থ করিলেন। গ্রীষ্মের অবকাশে তিনি ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে (continental tour) ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন—সঙ্গে চলিলেন Miss Muller। এই সময়ে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি অনেক দেশ ও বহু বিশিষ্ট জ্ঞানীমানী ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। Goodwin ও সারদানন্দ স্বামী এই সময়ে আমেরিকাতে ছিলেন। লেখক একলা লণ্ডনে Cambridge Streetএর বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। Sturdy মধ্যে মধ্যে আসিয়া ঐ বাড়ীতে থাকিতেন। কয়েক মাস পরে হৃতস্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার করিয়া স্বামিজী পুনরায় লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং এই ভ্রমণ উপলক্ষ্যে কন্টিনেণ্ট বিষয়ে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে জার্মানীর কথা উঠিলে তিনি বলিলেন—জার্মানীতে গমন করিলে অধ্যাপক ডয়সনের সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং বিশেষ হৃদ্যতাও হয়েছিল। তিনি একজন বেদান্তের বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং এই কারণে ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। যদিও পণ্ডিত বটে, বেদান্তও খুব পড়েছেন, কিন্তু হলে কি হবে—একঘর ছেলেপুলে। সকালবেলা উঠে ছেলেরা·

---

* টীকা—গ্রন্থকার।

রুটির জন্য চেঁচামেচি করবে, তাদের খাওয়ার চেষ্টা করবে না বেদান্ত চর্চা করবে। চুটিয়ে সংসার করতে গেলে আর বেদান্ত চিন্তা হয় না। তিনি ইহার বিষয় অনেক কথা বলতেন; কিন্তু স্বামিজীর কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গিতে বেশ স্পষ্ট বোধ হইত যেন, ডয়সন তাঁহার শিষ্যস্থানীয়, সমকক্ষ হইবার যোগ্য নহে। সম্ভবতঃ লণ্ডনে আগমন-পূর্বক তিনি স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। Sturdyর সহিত এই বিষয়ে আলোচনাকালে ডয়সন বিষয়ে স্নেহ প্রকাশ করিয়া স্বামিজী স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতেন এবং Sturdy ও "আজ্ঞে, তা বটে।" বলিয়া কথার অনুমোদন করিত। এই কথার উদ্দেশ্য এই যে, স্বামিজীর এইরূপ অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও অত্যাশ্চর্য শক্তি ছিল যে, জার্মানী প্রদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতও তাঁহার নিকট শিষ্যের ন্যায় নতমস্তকে বিনীতভাবে অবস্থান করিতেন। কদাপি সমকক্ষের মত সমান অধিকারী হইয়া বাক্যালাপ করিতে সাহস করিতেন না। এই বিষয়ে বহু কথা হইয়াছিল, কিন্তু লেখকের স্মরণ নাই।

এই ভ্রমণকালে প্যারিস নগরে অবস্থান সময়ে একটি ঘটনা হইয়াছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া এইস্থানে উহা প্রদত্ত হইল। একদিন Duchess De Pomaর সহিত একখানি ফিটন গাড়ী ভাড়া করিয়া প্যারিস হইতে নিকটবর্তী গ্রামের অভিমুখে স্বামিজী বায়ু-সেবনার্থ গমন করিতেছিলেন। স্বামিজী ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ঐ ভাষাতে সুন্দররূপে কথাবার্তাও কহিতে পারিতেন। Duchess ইংরাজি ভাষাতে স্বামিজীকে বলিলেন, "এই গাড়ীর কোচম্যানটি অতি উৎকৃষ্ট পরিমার্জিত ফরাসী ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে।" এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে ঐ গাড়ী একটি গ্রামের রাস্তার ধারে আসিয়া পৌঁছিল। একটী ঝি, ছোট একটী ছেলে ও আর একটী মেয়েকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। গাড়োয়ানটি গাড়ী থামাইয়া নামিয়া আসিয়া সেই

ছেলেমেয়ে দুটিকে কোলে করিয়া খুব আদর করিল এবং মুখ চুম্বন করিয়া সস্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া ও আদর করিয়া পুনরায় ঐ গাড়ীতে আসিয়া বসিল। Duchess De Poma আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন যে ছেলে মেয়ে দুইটী ভদ্রলোকের ছেলে মেয়ে, আর এ লোকটিত গাড়োয়ান, ছেলে মেয়ে দুটিকে কিরূপে এরূপ আদর যত্ন করিল।

তখন Duchess সেই গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই ছেলেমেয়ে দুটিকে আদর করিলে কেন? ইহারা ত ভদ্রলোকের ছেলে!" তখন গাড়োয়ানটি গাড়ী থামাইয়া Duchessএর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিল, "এ ছেলেমেয়ে দু'টি আমারই। প্যারিসে অমুক ব্যাঙ্কের নাম শুনিয়াছেন?" Duchess বলিলেন, "সে ত বড় ব্যাঙ্ক ছিল। সেই ব্যাঙ্ক ত উঠিয়া যায়।" গাড়োয়ানটি বলিল, "আমি সেই ব্যাঙ্কের মালিক। দেখিলাম ব্যাঙ্ক ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। টাকা পয়সা আদায় উশুল করিতে কয়েক বৎসর লাগিবে। এই সময় অপরের গলগ্রহ হইবার কোনও আবশ্যক নাই। স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে গ্রামে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছি। কেবল একটি ঝি তাহাদের দেখাশুনা করে। আমার যৎসামান্য যাহা ছিল, তাহা দিয়া আমি একখানি ফিটন গাড়ী কিনিয়া গাড়োয়ানী কাজ করিতেছি। ইহাতে যাহা পাই স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করিয়া নিজেরও খরচ চালাইয়া লই। তবে আদায় উশুল সব নিকেস হইলে, পুনরায় ব্যাঙ্ক খুলিব এবং আগেকার মত ব্যাঙ্কার হইয়া থাকিব।"

স্বামিজী এই উপাখ্যানটী অতি বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া সকলকে বলিতেন, "এই লোকটি হচ্ছে যথার্থ practical Vedantist. বেদান্তের সারমর্ম এই লোকটি বুঝিয়াছে। এইরূপ উচ্চাবস্থা হইতে এত নীচে পড়িয়াছে কিন্তু তাহাতেও স্থির, ধীর হইয়া কার্য করিতেছে। কোনও প্রকারে অভিভূত হয় নাই। ধন্য এই লোকটির মনের

শক্তি। এই লোকটি হচ্ছে যথার্থ Vedantist।" স্বামিজী এই উপাখ্যানটি হর্ষিত হইয়া অনেক দিন বলিয়াছিলেন। সকল কথা এখন আমার স্মরণ নাই। এতদ্ব্যতীত কন্টিনেন্টের বিষয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন, সকল কথা এখন আর মনে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

শিব ওঁ।

পুণ্যদর্শন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর তালিকা

১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান (২য় সংস্করণ)	৩'৫০ ন.প.
২।	শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী ১ম খণ্ড, (২য় সংস্করণ)	৩'২৫ "
৩।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)	২'৭৫ "
৪।	কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ)	২'০০ "
৫।	শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী	৩'০০ "
৬।	শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সংস্করণ)	'৫০ "
৭।	গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ)	'৫০ "
৮।	দীন মহারাজ	'৫০ "
৯।	ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ	১'০০ "
১০।	সাধুচতুষ্টয় (২য় সংস্করণ)	১'২৫ "
	(সারদেশ্বরী আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত)	
১১।	মাতৃদ্বয় (গৌরী মা ও গোপালের মা)	'২৫ "
১২।	ব্রজধাম দর্শন	১'৫০ "
১৩।	নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	১'০০ "
১৪।	বদরীনারায়ণের পথে	২'২৫ "
১৫।	পাশুপত অস্ত্রলাভ	৫'০০ "
১৬।	মায়াবতীর পথে	১'০০ "
১৭।	গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প	১'৫০ "
	(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	
১৮।	সঙ্গীতের রূপ	১'৫০ "
১৯।	নৃত্যকলা	১'০০ "
২০।	পশুজাতির মনোবৃত্তি	'৭৫ ন.প.
২১।	তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান	২'০০ "
২২।	বাংলা ভাষার প্রধাবন	২'০০ "
২৩।	খেলাধূলা ও পল্লীসংস্কার (২য় সংস্করণ)	'২৫ "

২৪। খেলাধূলা ও পল্লীসংস্কার (নেপালী অনুবাদ) ·১২ „
২৫। জে. জে. গুডউইন ১·০০ „
২৬। গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান ৫·০০ „

Religion, Philosophy, Psychology

1. Natural Religion 1·00N.P.
2. Energy 1·25 „
3. Mind 1·00 „
4. Mentation 2·00 „
5. Reflections on Woman
   (To be had of Saradeswari Asram.)

Art & Architecture

6. Principles of Architecture 2·50 „

Social Sciences

7. Homocentric Civilization 1·50 „
8. Lectures on Status of Toilers 2·00 „
9. Lectures on Education 1·25 „
10. Federated Asia 4·50 „
11. Nation 2·00 „
12. New Asia 1·00 „
13. Temples and Religious Endowments ·50 „
14. National Wealth 5·50 „
15. Rights of Mankind ·50 „

Literary Criticism

16. Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra (2nd. Edition) 1·00 „

Science Series

17. Formation of the Earth 2·00 „

Books in the Press.

1. Cosmic Evolution
2. Metaphysics (2nd. Edition)

THE
MOHENDRA PUBLISHING COMMITTEE
3, Gour Mohon Mukherji Street, Calcutta-6.